সাংখ্যতত্ত্বসমীক্ষায় আধুনিক বাঙালি মনীষা

পিএইচ.ডি. গবেষণা নিবন্ধ (আর্টস)

সারসংক্ষেপ

উপস্থাপক

স্বাধীন কুমার মণ্ডল

নির্দেশিকা

ড. কাকলী ঘোষ

সহযোগী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২১

সূচিপত্র

অধ্যায়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা	৩ - ৬
দ্বিতীয় অধ্যায়: সাংখ্যদর্শনের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ	৭ - ১৩
তৃতীয় অধ্যায়: বঙ্কিম-ভাবনায় সাংখ্যদর্শন	১৪ - ২০
চতুর্থ অধ্যায়: সাংখ্যের ঐতিহ্যানুসন্ধানে স্বামী বিবেকানন্দ	২১ - ২৭
পঞ্চম অধ্যায়: রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-চিন্তনে সাংখ্যদর্শন	২৮ - ৩৪
ষষ্ঠ অধ্যায়: বাঙালির সাংখ্যচর্চার ইতিবৃত্ত	৩৫ - ৪০
সপ্তম অধ্যায়: উপসংহার	৪১ - ৪৪
গ্রন্থপঞ্জি	৪৫ - ৪৭

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

‘সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী / রেখেছো বাঙালী করে মানুষ করোনি’[১] - কবিগুরু-কৃত এইরূপ শ্লেষোক্তি হোক কিংবা ‘what Bengal thinks today, India thinks tomorrow’- গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লেকৃত এইরূপ সদুক্তি; কার বক্তব্য আজকের বাঙালি জীবনে প্রাসঙ্গিক তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হতেই পারে। তবে কালপ্রবাহের অবিচ্ছিন্ন ব্যাপ্তিতে এমন এক সময় ছিল যখন বাঙালি মনীষার মনন ও চিন্তন সমগ্র সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

যুক্তি প্রতিযুক্তির সেইকালে নব্যন্যায়ের সর্বাধিক বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে বাঙালি মনীষার অবদান দর্শনের সমস্ত পাঠক ও আলোচকদের নিকট সর্বজনবিদিত। এমনকি অদ্বৈত বেদান্তের ব্যাখ্যা ও চর্চাতেও বাঙালি মনীষার নিযুক্তি অবিসংবাদিতভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। কিন্তু প্রশ্ন যদি হয় সাংখ্যচর্চায় বাঙালি মনীষার অবদান কতখানি বা বলা ভালো কতটুকু, তাহলে উত্তর খুঁজতে সাংখ্যচর্চার ইতিহাসকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে আনতে হয়। কারণ সাংখ্য যেমন নব্যন্যায়ের মতো পুষ্প পত্র পল্লবিত দীর্ঘশাখায় রূপান্তরিত হতে পারেনি, তেমনই বাঙালির তথাকথিত বেদান্তচিন্তার ‘কপিরাইটে’র ধাক্কায় মূল শিকড়টিকে গভীরে প্রোথিত করতে পারেনি। তাহলে সাংখ্যচর্চায় বাঙালির নিযুক্তি ঠিক কতটা? টীকা-টিপ্পনী নির্ভর প্রত্যক্ষ আলোচনা, প্রাসঙ্গিক আলোচনা, এবং মৌলিক আলোচনা উপলব্ধ। তবে সবই পরিমাণে স্বল্প। যদিও সর্বত্র একথা বারংবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে যে সাংখ্যের মতবাদকে মূলধন করেই ভারতীয় আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনগুলির সবকটিই তাদের ‘পসার’ জমিয়েছিল।

মোক্ষের সন্ধানে ভারতীয় মনীষা শ্রুতির উৎসপথ ছাড়িয়ে ক্রমে স্মৃতির প্রমাণসাপেক্ষে ন্যায়ের ভাষায় ব্রতী হয়েছিলেন। সূত্র-ভাষ্যের দ্বারা পরমতত্ত্বের পর্যালোচনায় এক এক মত ও পথকে আশ্রয় করে সেই সত্যের স্বরূপে উপনীত হয়েছেন চিন্তাবিদরা। গড়ে উঠেছে সম্প্রদায়। বিচার-বিশ্লেষণ, যুক্তি-প্রতিযুক্তির সেই ধারাভাষ্য কেউ বেদের প্রামাণ্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করে পরিবেশন করেছেন, কেউ বা তার প্রয়োজনীয়তাই বোধ করেননি। এদের মধ্যে পূর্বোক্ত পরম্পরাটি ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ‘আস্তিক সম্প্রদায়’ এবং পরবর্তী পরম্পরাটি ‘নাস্তিক সম্প্রদায়’ নামে প্রচলিত হয়েছে। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা এই ষড়্‌দর্শন আস্তিক দর্শনরূপে এবং চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন দর্শন নাস্তিক দর্শনরূপে খ্যাত হয়েছে। আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে সাংখ্যের প্রণেতারূপে কপিল, যোগপ্রবক্তারূপে পতঞ্জলি, ন্যায়প্রণেতারূপে গৌতম, বৈশেষিকদর্শনকাররূপে কণাদ, পূর্বমীমাংসকরূপে জৈমিনি ও উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তসূত্রকাররূপে বাদরায়ণ ব্যাস প্রসিদ্ধ।

পরমর্ষি কপিল হলেন সাংখ্যতত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা। তাঁর শিষ্য আসুরি। আসুরির নিকট পঞ্চশিখ সাংখ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তাকে বহু বিস্তৃত করেন। শিষ্যপরম্পরায় এই তত্ত্ব মহামতি ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রাপ্ত হন এবং আর্যা ছন্দে সত্তরটি কারিকায় *সাংখ্যকারিকা* রূপে তা প্রকাশ করেন। এটিই বর্তমানে সাংখ্যদর্শনের প্রচলিত প্রামাণিক গ্রন্থ। পরবর্তী কালের টীকা-টিপ্পনীগুলির বেশিরভাগই সাংখ্যকারিকার উপর রচিত হয়। বাচস্পতি মিশ্রের *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অজ্ঞাতকর্তৃক *যুক্তিদীপিকা* ও *জয়মঙ্গলা* টীকার পরিচয়ও পাওয়া যায়। তবে *সাংখ্যসূত্র* নামে যে

গ্রন্থ পাওয়া যায়, তার প্রামাণ্য বিচারসাপেক্ষ। তাই প্রচলিত সাংখ্যসিদ্ধান্তগুলি ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা'নুসারেই ব্যাখ্যেয়।

ন্যায় বা বেদান্ত দর্শনে যেরূপ উৎপত্তিকাল থেকে প্রায় ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু ভাষ্য-টীকার প্রণয়ন অব্যাহত ছিল, সাংখ্যের সেই ধারায় দ্বিতীয় শতাব্দী হতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কালের ব্যাপ্তি থাকলেও কারিকা-ভাষ্য/টীকা-তট্টীকা এই পরম্পরায় গ্রন্থের অপবর্গ অঙ্গুলিগ্রন্থি পরিমিত।[২] তথাপি, টীকা-টিপ্পনী নির্ভর প্রত্যক্ষ আলোচনায় বেশ কিছু বাঙালির এই বিষয়ে নিযুক্তি প্রশংসনীয়। এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় নবজাগরণের উন্মেষে যে কয়েকজন মনীষী ভারততত্ত্ব নিয়ে সারস্বত চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন, 'সাংখ্য' নিয়ে তাদের যুগোপযোগী প্রাসঙ্গিক ও মৌলিক আলোচনাও কৃতিত্বের দাবি রাখে। কারণ, শুধুমাত্র তত্ত্ব ও তথ্যের চর্বিতচর্বণে সেই শব্দভাণ্ডার খরচ হয়নি বরং পাশ্চাত্য দর্শন, আধুনিক বিজ্ঞান, বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে সাংখ্যের 'মাল্টিডাইমেন্‌শনাল অ্যাপ্রোচে'র মাধ্যমে অত্যন্ত মনোগ্রাহী ও গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছে।

সাহিত্যসম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবিষয়ে অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর 'সাংখ্যদর্শন' নামক প্রবন্ধে তিনি সাংখ্যের তত্ত্ব ও তথ্যগুলির অত্যন্ত মনোগ্রাহী ও বাস্তব আলোচনা করেছেন। তাঁর দৃষ্টি অনেক আধুনিক এবং স্পষ্ট। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর 'লক্ষ্য পাঠক' (target reader) পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং "এই শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলেও তাহা বুঝিতে পারেন না"।[৩] পাশ্চাত্য শিক্ষার বশবর্তী হওয়ায় প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা-প্রণালী ঐ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অপরিচিত। তাই "তাঁহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, পাশ্চাত্য ভাবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়"।[৪] তাঁর সমগ্র আলোচনা জুড়ে সাংখ্যের অন্যান্য দিকও স্পষ্ট।

বিবিধ প্রসঙ্গে যাঁরা সাংখ্যদর্শনের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন তাঁদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। অদ্বৈত বেদান্তের প্রচারক রূপেই তাঁর প্রসিদ্ধি, অথচ এই বেদান্তের আলোচনা করতে গিয়েই সাংখ্যদর্শনের বিবিধ তত্ত্ব ও তথ্যের কথা উঠে এসেছে। যেমন সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে বেদান্ত ও সাংখ্যের আপাতবিরোধ প্রতীত হলেও ভিতরের মূলসুর একই তারে বাঁধা।[৫] তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে জগতের প্রতিটি দর্শনশাস্ত্রই সাংখ্যদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কপিলের নিকট ঋণী। সেই কারণেই কপিলের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা জগতের সকল দার্শনিকেরই উচিৎ।[৬] বিবেকানন্দের অসংখ্য দার্শনিক বক্তৃতা ও রচনাবলীর ছত্রে ছত্রে সাংখ্যের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। তিনি পাঠকদের সচেতনভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন দর্শনশাস্ত্রের জনকস্বরূপ মহর্ষি কপিল প্রত্যেকের নিকট শ্রদ্ধেয়। পাশ্চাত্য বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে বিবেকানন্দ সাংখ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন করেছেন।

আবার জড় বিজ্ঞানের বিবিধ ব্যাখ্যানাবসরে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী সাংখ্যের তত্ত্বগুলির পর্যালোচনা করেছেন; সে 'প্রকৃতি' কিংবা 'পঞ্চ ভূত' কিংবা 'জগতের অস্তিত্ব' কিংবা 'সৃষ্টিতত্ত্ব' যাই হোক না কেন। বিজ্ঞানকে উপরের খোলস থেকে নয়; একেবারে নিজ বিশ্বাস-অবিশ্বাস তথা আনন্দ-নিরানন্দের সাথে মিলিয়ে সেই অভিজ্ঞতার নিরিখে দার্শনিক

ব্যাখ্যার সুলুকসন্ধানে তৎপর হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই দর্শন তাঁর কাছে কেবল 'কথার মারপ্যাঁচ' ছিল না, বরং তা ছিল বৈজ্ঞানিক সত্যবিচারের মঞ্চ। আর এই দুই পথে তিনি হেঁটে গেছেন সাহিত্যসুধা বর্ষণের মধ্যে দিয়ে।

উক্ত ত্রয়ী'র রচনায় বিশেষ স্তর লক্ষ্য করার মত। বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনায় শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার অনুপাত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার তুলনায় বেশি, বিবেকানন্দের আলোচনায় এই সমীকরণ অনেকটা সমান অনুপাতেই উপলব্ধ আর রামেন্দ্রসুন্দরের আলোচনায় শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার অনুপাত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার তুলনায় অনেক কম। যুগের চাহিদা এবং সম্ভবত শাস্ত্রীয় শিক্ষার হ্রাস এর জন্য দায়ী।

সুপ্রাচীন উপনিষদের সময় থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময় জুড়ে সাংখ্যের মূল ধারণাটির উত্তরণ ঘটেছে ধারাভাষ্যের মধ্যে দিয়ে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কারিকাকার, টীকাকার, ভাষ্যকার, প্রবন্ধকার, সমালোচক তাদের ভাষ্যস্রোতে সাংখ্যধারাকে প্রবহমান রেখেছেন। সাংখ্যদর্শনের ঐ প্রবাহে অন্যান্য বাঙালি মনীষাও তাদের মূল্যবান যোগদান রেখে গেছেন টীকা, টিপ্পনী, ভাষ্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনার মধ্যে দিয়ে। সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী, অনুবাদ, প্রবন্ধ, সমালোচনা ও সম্পাদিত গ্রন্থ প্রণয়নে সুরেন্দ্রনাথ রায়, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কালীবর বেদান্তবাগীশ, পুলিনবিহারী চক্রবর্তী, স্বামী হরিহরানন্দ অরণ্য, পঞ্চানন তর্করত্ন, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কুঞ্জবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত, রমেশ চন্দ্র তর্কতীর্থ, কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন এর মত অনেক বাঙালি মনীষার নিযুক্তি উল্লেখ করার মত।[৭] সাংখ্যতত্ত্বসমীক্ষায় যা আধুনিক বাঙালির চিন্তনের গভীরতার দিক্-নির্দেশক।

উল্লেখপঞ্জি

[১] *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, *বঙ্গমাতা* (চৈতালি), পৃ. ৬৭১

[২] *Encyclopedia of Indian Philosophies*. Vol. IV. pp. 14-17

[৩] *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৮০

[৪] তত্রৈব

[৫] Kakali Ghosh, "Legacy of Sāṁkhya Concepts in Śaṁkara's Interpretation: An Exegesis", *The Quintessence of Yoga*, pp. 65-80

[৬] The Sankhya philosophy of Kapila was the first rational system that the world ever saw. Every metaphysician in the world must pay homage to him. (*The Complete Works of Swami Vivekananda*, Vol. II, p-445)

[৭] Karl. H. Potter, *Encyclopedia of Indian Philosophies*. Vol. I.(Bibliography)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ৰহচ্চৈবমিদং শাস্ত্রমিত্যাহুর্বিদুষো জনাঃ।
অস্মিংশ্চ শাস্ত্রে যোগানাং পুনর্বেদে পুরঃ সরঃ।।
(*বৈয়াসিক-মহাভারতম্*, শান্তিপর্ব, শ্লোক-৪৬)

সাংখ্যদর্শনের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

Sāṁkhya is not one of the systems of Indian Philosophy.
Sāṁkhya is the philosophy of India!
(*Encyclopedia of Indian Philosophies*, Vol. IV)

২.০. ভূমিকা

চিন্তা কী? চিন্তা হচ্ছে এক বয়ে যাওয়া স্রোত, যার প্রবাহ বিরামহীন। বিরামহীন এই চিন্তাস্রোত ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয় গন্তব্যের দিকে। যে গন্তব্যের পারিভাষিক নাম 'দর্শন'। √দৃশ্ ধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয়ে করণবাচ্যে দর্শন শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। পাণিনীয় ধাতুপাঠে দৃশ্ ধাতুটি জ্ঞানার্থক- 'দৃশির্ প্রেক্ষণে'।[১] সুতরাং 'দৃশ্যতে যথার্থতত্ত্বমনেন ইতি দর্শনম্' এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে যথার্থজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় যে শাস্ত্রের দ্বারা তাই হল দর্শন। অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত সি.এম.জোয়াড্ মহাবিশ্বে আত্মার অভিযানের যে নথি, সেই নথিকেই দর্শন বলতে আগ্রহী এবং তাঁর মতে দার্শনিক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ঐ অভিযানে মানসিক ও আধ্যাত্মিক আনন্দান্বেষী।[২] অতএব মানসিক ও আধ্যাত্মিক অন্বেষণ হোক বা যথার্থজ্ঞানের অনুসন্ধান, সেই অনুসন্ধান বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব মানুষকে চিন্তাস্রোতে ব্যাপৃত করল। উদ্ভাবিত হল জীবন জিজ্ঞাসা। আর উত্তরের খোঁজে শুরু হল তত্ত্বের বিচার, তথ্যের বিশ্লেষণ, যুক্তির নিরূপণ, প্রতিযুক্তির পৃথক্করণ। শুভ মহরৎ হল দর্শনের।

২.১. সত্যের দিগ্দর্শনে সত্যান্বেষীগণ

মানব মনের নিরন্তর চিন্তাস্রোতের ফসল রূপে যে দর্শনের গোড়াপত্তন, সেই দর্শন আত্মার অভিযান নাকি অনুসন্ধান? যদি বলা হয় অভিযান মাত্র, তাহলে প্রশ্ন হয় ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এই অভিযান কীসের উদ্দেশ্যে? আর যদি বলা হয় অনুসন্ধান মাত্র, তাহলে প্রশ্ন হয় সেই আত্মানুসন্ধান প্রকৃতপক্ষে কীসের অন্বেষণ? অবশ্য উভয়ত্রই উত্তর এক। সত্যের অনুসন্ধানেই বা সত্যান্বেষণেই এই যাত্রা।

২.২. প্রথম আলোর খোঁজে (সাংখ্যই প্রথম তত্ত্বান্বেষণের পদক্ষেপ)

আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে আবির্ভাবের পৌর্বাপর্য নিশ্চিতভাবে বলা শ্রমসাধ্য, তবে আনুমানিক বলা চলে সাংখ্যদর্শনই এই ধারায় প্রথম পথ আর মহর্ষি কপিল হলেন এই পথের প্রথম অভিযাত্রী। *শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের* 'ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে...' ইত্যাদি মন্ত্রে কপিলের উল্লেখ সাংখ্যদর্শনের প্রাচীনত্বের দাবি করে এরূপ ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অভিমত।[৩] যদিও মন্ত্রোল্লিখিত এই 'কপিল' আক্ষরিক অর্থেই মহর্ষি কপিল কিনা সেবিষয়ে সংশয় থেকে যায়।[৪] তবে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বৈয়াসিক-মহাভারত* ইত্যাদি গ্রন্থে মহর্ষি কপিলের নাম সমাদরের সাথে গৃহীত হয়েছে। *যুক্তিদীপিকা*কারের মতে সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন দেবগণের মধ্যে কপিল সর্বপ্রথম। অন্যান্য দর্শনপ্রণেতাদের মধ্যে মহর্ষি কপিলই শাস্ত্রে গ্রন্থে এমন বহুধা ভাবে স্তুত হয়েছেন। তাই দর্শনকার রূপে মহর্ষি কপিল ও দর্শন রূপে সাংখ্যের প্রাচীনত্বের অনুমান করা চলে।

২.৩. সম্প্রদায়ের প্রাণপুরুষগণ

মহর্ষি কপিলকে সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা বলা হলেও তাঁর রচিত কোনও গ্রন্থ এখনও উপলব্ধ নয়। তাই সাংখ্য মতাদর্শের উপর প্রামাণ্যগ্রন্থরূপে ঈশ্বরকৃষ্ণের *সাংখ্যকারিকা*কে স্বীকার করা হয়।

একথা নিশ্চিত যে পরম্পরাগতভাবেই সাংখ্যের তত্ত্ব শ্রীমদ্ ঈশ্বরকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হয়েছে। কারিকারের কথাতেই তা স্পষ্ট-

এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরযেঽনুকম্পযা প্রদদৌ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায তেন চ বহুধা কৃতং তন্ত্রম্।।
শিষ্যপরম্পরযাগতমীশ্বরকৃষ্ণেণ স চৈতদার্যাভিঃ।
সংক্ষিপ্তমার্যমতিনা সম্যগ্‌বিজ্ঞায সিদ্ধান্তিতম্।।[৫]

অতএব, *সাংখ্যকারিকা* থেকে যতটুকু অনুধাবন করা যায়, সেই ক্রমে পরমর্ষি কপিল হলেন সাংখ্যের প্রথম প্রবক্তা। তাঁর শিষ্য আসুরি। আসুরির নিকট হতে বিদ্যালাভ করেন পঞ্চশিখ এবং পঞ্চশিখ হতে শিষ্যপরম্পরাক্রমে তা ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রাপ্ত হন। পঞ্চশিখ হতে ঈশ্বরকৃষ্ণ অবধি এই পরম্পরাটি স্পষ্ট নয়। অদ্যাবধি প্রমাণাভাবে কেবল এইটুকুই মেনে নেওয়া যায় ঐ পর্বেও সাংখ্যের ধারা বিস্তৃত হয়েছিল তবে তাদের নাম কালের গর্ভে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

২.৪. তত্ত্বে ও তথ্যে সাংখ্য

শ্রীমদ্ ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত *সাংখ্যকারিকা* অনুসারেই সাংখ্যের মূল বক্তব্যগুলি এখানে অনুসন্ধেয়। সমগ্র জগতের নিকট যে দার্শনিক চিন্তার উপাদান সাংখ্যদর্শন উপস্থিত করেছিল, তার একমাত্র প্রামাণ্য সংকলন যেহেতু *সাংখ্যকারিকা,* তাই সেই *সাংখ্যকারিকা* ও তার উপর সর্বদর্শনশিরোমণি বাচস্পতি মিশ্র রচিত *তত্ত্বকৌমুদী* টীকা ও অজ্ঞাতকর্তৃক রচিত *যুক্তিদীপিকা* টীকা অনুসারে সাংখ্যের তত্ত্বগুলি সর্বাগ্রে আলোচনীয়।

২.৪.১. দুঃখ

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ - সেই সুদূর অতীত থেকেই সুখের নিমিত্ত মানুষের একান্ত আকুতি। এই পৃথিবীতে সুখ কে না চায়? আর, ঠিক বিপরীতপ্রান্তে দুঃখ কে বা চায়? ঋষিকণ্ঠে তাই নিষেধবাণী শোনা যায় *মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্‌ভবেৎ*। অথচ জীবনের বৈপরীত্য এখানেই যে জগতে সুখ বেশী না দুঃখ বেশী তার যুক্তি-প্রতিযুক্তি খুঁজলে 'কালি-কলম কম পড়িয়া যাবে'। তবে আপাতভাবে যুক্তি-প্রতিযুক্তির বাইরে দুঃখাধিক্যেরই প্রতীতি হয়।

সাংখ্যতত্ত্বে দুঃখকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। *সাংখ্যকারিকা* কার কারিকার শুরুই করেছেন 'দুঃখ' শব্দের উল্লেখের মধ্যে দিয়ে *দুঃখত্রযাভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ*। তবে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই যে জীবমাত্রের অন্যতম প্রয়োজন, সেবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। প্রাণীমাত্রেই দুঃখ-যন্ত্রণাধীন এবং অগুণতি দুঃখভোগ তার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই দুঃখের বাস্তবিকই পরিসংখ্যান হয়না। এক এক ব্যক্তি কোটি কোটি দুঃখের মধ্যে দিয়ে যায়। তথাপি গ্রন্থকার বললেন *দুঃখত্রযা...* অর্থাৎ দুঃখত্রয়। তাহলে কি দুঃখের সংখ্যা তিনটি? কিন্তু ব্যক্তির তো অনেক দুঃখের অনুভব হয়। বস্তুত দুঃখের সংখ্যা না, দুঃখের প্রকার এখানে বিবক্ষিত। অর্থাৎ, জগতে যতপ্রকার

দুঃখ আছে সেই সমস্ত দুঃখ সংখ্যায় যতই হোক না কেন তা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।

২.৪.২. তত্ত্ব-উদ্দেশ

তত্ত্বজ্ঞান কষ্টসাধ্য তথা দুষ্কর হলেও, দুঃখনিবৃত্তিতে একমাত্র প্রশস্ত উপায়। তবে তত্ত্বজ্ঞানের পূর্বে 'তত্ত্ব'গুলির নির্দেশ করণীয়। *সাংখ্যকারিকায়* শ্রীমদ্ ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যের মূল পঁচিশটি তত্ত্বকে উদ্দেশ করেছেন প্রধান চারটি ভাগে। যথা- প্রকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতি, বিকৃতি এবং অনুভয় বা ন প্রকৃতি-ন বিকৃতি।
একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো যেতে পারে-

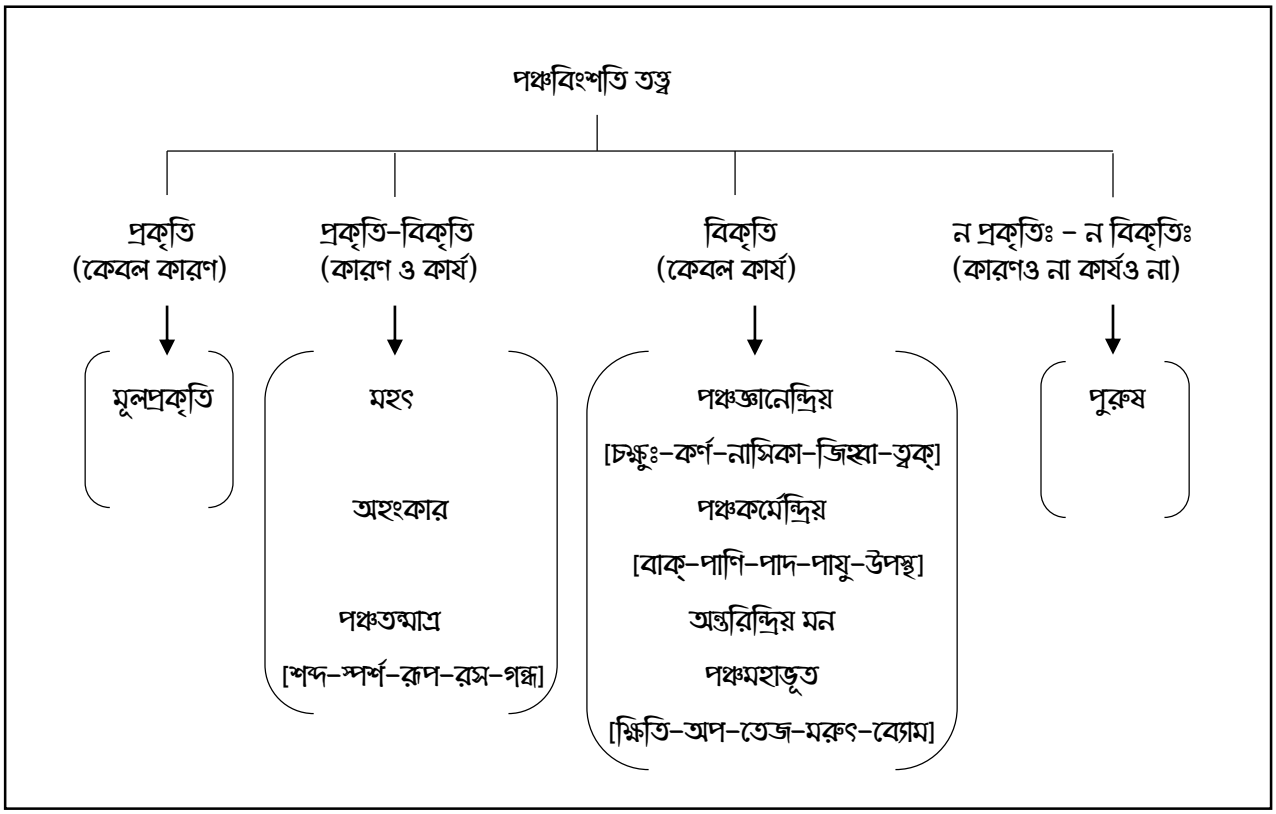

২.৪.৩. প্রমাণ

দুঃখনিবৃত্তির উপায়স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য কিন্তু বিবেচক ব্যক্তি শুধুমাত্র আবশ্যকতার বিচারে কোনও বিষয় গ্রহণ করেন না। অতএব বিষয়ের প্রামাণ্য স্বীকার অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সেইকারণেই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের যথার্থোপলব্ধির জন্য সামান্য ও বিশেষভাবে সাংখ্যসম্মত প্রমাণজ্ঞান আবশ্যক।

কারিকাকার প্রত্যক্ষের লক্ষণে বলেছেন, *প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং...*। বিষয় অর্থাৎ যা নিজ আকারের দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে আকারিত করে এবং প্রত্যক্ষের যোগ্য করে তোলে। যেমন ঘট,পট প্রভৃতি বাহ্যবিষয়, সুখ-দুঃখাদি আন্তরবিষয়। এখন এই এক একটি বিষয়ের সাথে যার সম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষ হয় তাই হল প্রতিবিষয় বা ইন্দ্রিয়। এবং এইরূপ প্রতিবিষয়ে বা ইন্দ্রিয়ে যে অধ্যবসায় হয় অর্থাৎ সেই সেই ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে বুদ্ধির যে পরিণাম বা জ্ঞান হয়, তাই হল দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ। অনুমানের লক্ষণে কারিকাকার বলেছেন, *ত্রিবিধমনুমানমাখ্যাতং তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্বকম্ ...*। লিঙ্গ (হেতু) প্রকৃতপক্ষে সেই ইন্দ্রিয়ের সাথে অসম্বন্ধিত পদার্থটিকে ব্যাপ্তির সাহায্যে জ্ঞাপন করে। সেকারণে লিঙ্গকে ব্যাপ্য বলে। এবং লিঙ্গের দ্বারা লিঙ্গীর (সাধ্য) জ্ঞান হয় বলে লিঙ্গী শব্দের অর্থ ব্যাপক। এখন এই ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবজ্ঞান ও ব্যাপ্যের পক্ষধর্মতাজ্ঞান থেকে যে বুদ্ধিবৃত্তি হয়, তাই হল অনুমান। শব্দপ্রমাণের লক্ষণে কারিকাকার বলেছেন *আপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনং তু* । আপ্ত কথার অর্থ প্রাপ্ত বা যোগ্যতাবিশিষ্ট। শ্রুতি শব্দে আপাতভাবে শ্রবণক্রিয়া বা বেদশাস্ত্রকে বোঝালেও এখানে বাক্যজনিত বাক্যার্থজ্ঞানকেই বুঝতে হবে। অতএব বাক্যজনিত বাক্যার্থজ্ঞান, যা কিনা সর্বপ্রকার দোষাশঙ্কা বিনির্মুক্ত, তাই হল শব্দপ্রমাণ বা আপ্তবচন।

২.৪.৪. প্রধান-সিদ্ধি

আকাশকুসুম, কূর্মরোম, শশবিষাণ, বন্ধ্যাপুত্র এগুলি প্রত্যক্ষ হয় না, কারণ এগুলি অলীক। অর্থাৎ অভাবত্বই এদের অপ্রত্যক্ষতার কারণ। এই একই যুক্তিতে প্রধানাদির অপ্রত্যক্ষতার প্রতি সেগুলির অভাবত্বকে কারণরূপে আপত্তি করা যেতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অভাবত্ব প্রধানাদির অপ্রত্যক্ষতার কারণ নয়। প্রত্যক্ষের বাধক দোষই প্রধানাদির অপ্রত্যক্ষতার কারণ।

প্রকৃতি আছে এবং প্রকৃতির অস্তিত্বের উপলব্ধি হয় তার কার্য থেকে – 'কার্যতস্তদুপলব্ধিঃ'। মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি হচ্ছে সেই কার্য, যেগুলি একাধারে প্রকৃতির সরূপও বটে আবার বিরূপও।[৬] অতএব প্রকৃতি সকল জন্য বস্তুর বা কার্য বস্তুর কারণ অর্থাৎ সৎ কারণ থেকে সৎ কার্য উৎপন্ন হয়। সাংখ্যে সৎ কারণ হতে সৎ কার্যোৎপত্তি স্বীকৃত হয়েছে। উপাদান কারণ একেবারে বিজাতীয় কার্য উৎপাদনে অক্ষম বলেই তাঁরা মনে করেন- 'সতঃ সত্ জাযতে ইতি বৃদ্ধাঃ'। অতএব, কারণ সৎ, কার্যও সৎ এবং উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণের মধ্যেই অবস্থান করে।

২.৪.৫. পুরুষ-সিদ্ধি

কার্য ব্যক্ত ও কারণ অব্যক্ত- এই বিষয়টি সাধারণভাবে নিরূপিত হয়েছে। কিন্তু এরা উভয়েই জড়। অথচ এই সংসার চিৎ ও জড় উভয়কে নিয়েই। তাই কারিকাকার নিজেও জ্ঞাপন করেছেন যে, '...ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ'।

অতএব সেই 'চিৎ' বা 'জ্ঞ' এর ধারণা এবার আবশ্যক। সাংখ্যশাস্ত্রে যেটি 'পুরুষ', সেটিই অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রে 'আত্মা' শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। ব্যক্ত-অব্যক্তের পরিচয় প্রদানের পর স্বাভাবিক ক্রমে 'জ্ঞ' বা 'পুরুষ' এর সিদ্ধিতে

ব্রতী হয়ে পাঁচটি যুক্তির (সংঘাতপরার্থত্বাত্, ত্রিগুণাদি-বিপর্যয়াদ্, অধিষ্ঠানাত্, ভোক্তৃভাবাত্ ও কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেঃ) অবতারণা করেছেন কারিকাকার।[৭]

২.৪.৬. সৃষ্টিক্রম

সংযোগ বা সম্বন্ধের প্রসঙ্গ উঠলে এবং সেই সম্বন্ধ যদি প্রকৃতি ও পুরুষের মত দুটি পারস্পরিক ভিন্ন পদার্থের হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় এমন দুটি ভিন্ন পদার্থের পারস্পরিক সম্বন্ধ কীভাবে সম্ভব? উত্তরে বলা যায়, নিজ নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য এই দুই ভিন্ন পদার্থ একে অপরের সহকারিত্ব প্রাপ্ত হয় বা বলা ভালো একে অপরকে অপেক্ষা করে। প্রধানের প্রয়োজন 'দর্শনার্থম্' এবং পুরুষের প্রয়োজন 'কৈবল্যার্থম্'।[৮]

অতিসূক্ষ্ম প্রকৃতি হতে সহসা একই সময়ে সকল পদার্থের সৃষ্টি হয় না, ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে প্রথম পদার্থ সৃষ্টি হওয়ার পর পুনরায় প্রকৃতি থেকে দ্বিতীয় পদার্থ সৃষ্টি হয় না, প্রকৃতপক্ষে সৃষ্ট প্রথম পদার্থ থেকে দ্বিতীয় পদার্থ এবং দ্বিতীয় পদার্থ থেকে তৃতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। যেমন বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে পত্র, পত্র থেকে শাখা এবং ক্রমে ধান উৎপন্ন হয় তেমনই প্রকৃতি থেকে প্রথম উৎপন্ন হয় মহৎ, মহৎ থেকে অহংকার, অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় এবং সর্বশেষে পঞ্চতন্মাত্র থেকে স্থূল পঞ্চমহাভূত।

২.৪.৭. বন্ধন বা মুক্তি- প্রকৃতির অথবা পুরুষের?

সাংখ্যমতে পুরুষ সদামুক্ত। এটি পুরুষের কোনও অবস্থান্তর নয় বরং পুরুষের স্বভাব। এমনকি প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে দেখা যায় সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের সাথে পুরুষের কোনও সম্বন্ধ নেই। অর্থাৎ পুরুষ অপরিণামী। ফলত বন্ধন, মোচন ইত্যাদি পরিণাম পুরুষে সম্ভাবিত হতে পারে না- *তস্মান্ন ৰধ্যতেঽদ্ধা নাপি মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ*।[৯] তাহলে বন্ধন কার? বন্ধন হল প্রকৃতির। নানাপুরুষাশ্রিতা প্রকৃতিই বদ্ধ হয়, সংসরণ করে ও মুক্ত হয়- *সংসরতি ৰধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রযা প্রকৃতিঃ*।[১০]

২.৪.৮. প্রচার-প্রসার ও অস্তিত্বের সংকট

সাংখ্যের তত্ত্ব অতীব উপাদেয় ও সহজবোধ্য, যেকারণে স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা প্রবাহের মধ্যে থেকেও সাংখ্যমতের উপলব্ধি সম্ভব এবং সেই উপলব্ধি থেকে মুক্তিলাভও সম্ভব।[১১] সাংখ্যের তত্ত্ব জনসমাজে এতটাই স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য ছিল যে কবিরাও তাদের কাব্যবর্ণনায় উপমারূপে অবলীলাক্রমে মহৎ ও অব্যক্তের প্রসঙ্গ উপস্থিত করেছেন। মহাকবি কালিদাসের বয়ানে-

পযোধরৈঃ পুণ্যজনাঙ্গনানাং নির্বিষ্ট হেমাম্বুজরেণু যস্যাঃ
ৰাহ্মং সরঃ কারণমাপ্তবাচো ৰদ্ধেরিবাব্যক্তমুদাহরন্তি।[১২]

তবে বহুল প্রচারিত সাংখ্যও কালে কালে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে মূলধারা হতে সরে আসতে থাকল। *ব্রহ্মসূত্রের* ভাষ্যকার শংকরাচার্য তৎপ্রণীত ভাষ্যে 'প্রধানমল্লনির্বহণ ন্যায়ে' সাংখ্যের যুক্তিকে পরাস্ত করলেন। ক্রমাগত আক্রমণে সাংখ্যের বিস্তৃত জমি ধীরে ধীরে তার উর্বরতা হারিয়ে ফসলহীন ভূমিতে পরিণত হওয়ায়, সাংখ্যের অস্তিত্বে সংকটের এক গভীর প্রশ্নচিহ্ন রেখে দিয়েছিল।

২.৫. উপসংহার

দার্শনিক চিন্তাভাবনার গোড়াপত্তনের কথা বললে অবশ্যই উপনিষদের প্রসঙ্গই প্রথম আপতিত হয়, তবে যুক্তিনির্ভর আলোচনার দিক থেকে সাংখ্যই একপ্রকার প্রথম পদক্ষেপ। পরবর্তীতে তার অবদান সুদূরপ্রসারী। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ জুড়ে সাংখ্যের কীর্তির মতো অন্য কোনও দর্শনের বা শাস্ত্রের নেই। তাঁর কথায়, *...ভারতবর্ষে সাংখ্য যে কীর্তি করিয়াছে, তাহা অন্য দর্শন দূরে থাকুক, অন্য কোন শাস্ত্রের দ্বারা হইয়াছে কি না, সন্দেহ* ।[১৩] তাই সাংখ্য ভারতীয় দর্শনের কেবল একটি শাখা মাত্র- এরূপ বললে যথার্থ বিচার হয় না। বরং একথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হয় না যে সাংখ্যই ভারতের দর্শন। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের ভাষায়- *Sāṁkhya is not one of the systems of Indian Philosophy. Sāṁkhya is the philosophy of India*![১৪]

উল্লেখপঞ্জি

[১] *পাণিনীয় ধাতুপাঠ,* ১০৩০

[২] Swami Prajnanananda, *Schools of Indian Philosophical thought*, Intro, p.1

[৩] ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *সাংখ্যদর্শন*, পৃ. ১৯

[৪] *শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্,* শাংকরভাষ্য (৫/২) (কপিলম্। বাসুদেবস্যাবতারভূতং সগরপুত্রাণাং দগ্ধারং ন তু সাংখ্যপ্রণেতা কপিলঃ)

[৫] ঈশ্বরকৃষ্ণ, *সাংখ্যকারিকা*, কারিকা ৭০ ও ৭১

[৬] মহদাদি তচ্চ কার্যং প্রকৃতিসরূপং বিরূপং চ (ঈশ্বরকৃষ্ণ, *প্রাগুক্ত,* কারিকা ৮)

[৭] সংঘাতপরার্থত্বাত্ ত্রিগুণাদিবিপর্যযাদধিষ্ঠানাত্/ পুরুষোহস্তি ভোক্তৃভাবাত্ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ (ঈশ্বরকৃষ্ণ, *প্রাগুক্ত,* কারিকা ১৭)

[৮] পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য/ পঙ্গ্বন্ধবদুভযোরপি সংযোগস্তত্কৃতঃ সর্গঃ (ঈশ্বরকৃষ্ণ, *প্রাগুক্ত,* কারিকা ২১)

[৯] ঈশ্বরকৃষ্ণ, *প্রাগুক্ত,* কারিকা ৬২

[১০] তত্রৈব

[১১] হস পিব লল খাদ মোদ নিত্যং ভুঙ্ক্ষ্ব চ ভোগান্ যথাভিকামম্/যদি বিদিতং তে কপিলমতং তত্প্রাপ্স্যসি মোক্ষসৌখ্যমচিরেণ। (মাঠরবৃত্তি)

[১২] কালিদাস,*রঘুবংশম্,* ১৩/৬০

[১৩] *বঙ্কিম রচনাবলী,* দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২২১

[১৪] Encyclopedia of Indian Philosophies, Vol. IV, Ed. Larson & Bhattacharya, Preface, p. xi

তৃতীয় অধ্যায়

"যাহা প্রাচীন, তাহাই যে উপধর্মকলঙ্কিত বা সর্বজনপরিজ্ঞাত, এমন মনে করিবেন না। বিবেচক দেখিবেন, সাংখ্যদর্শনে একটু সারও আছে। অসার বৃক্ষে এমন স্থায়ী ফল ফলিবে কেন?"

– বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, *সাংখ্যদর্শন*

বঙ্কিম-ভাবনায় সাংখ্যদর্শন

"স্পষ্টাক্ষরে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে যে সকল দর্শনশাস্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে, সাংখ্যের ন্যায় কেহ বহু ফলোৎপাদক হয় নাই।"

- বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, *সাংখ্যদর্শন*

৩.০. ভূমিকা

সাহিত্যে হোক, শিল্পে হোক, বা সংস্কৃতিতে; নবজাগরণ প্রকৃতপক্ষে চিন্তার। কেননা চিন্তাধারার পরিবর্তনই ঐ ঐ ক্ষেত্রগুলিতে নতুনতার জোয়ার নিয়ে আসে। যা দীর্ঘকাল আবৃত হয়ে আছে পুরানো পলেস্তারার আস্তরণে, সেই খোলনলচে পাল্টে নতুন বুনোটে আঁটোসাঁটো করে রাখতে সাহায্য করে। এই পূণ্য বঙ্গভূমিতেও সাহিত্যে, শিল্পে তথা সংস্কৃতিতে নবজাগরণের জোয়ার দুকূল প্লাবিত করে প্রত্যেকটি স্তরের ঊষর মৃত্তিকায় উর্বর পলির সঞ্চার করেছিল। আর এক একজন বঙ্গরতন, কখনও সাহিত্যিকরূপে, কখনও বা সমাজসংস্কারক রূপে, কখনও বা ব্যক্তি হিসেবে, সেই মৃত্তিকায় নিজ নিজ মতাদর্শের জোগান দিয়ে জনকল্যাণের ফসল ফলিয়েছেন। যার পরিণতিরূপে সমাজ ও সাহিত্য সুদীর্ঘকাল জুড়ে বেঁচে থাকার ও এগিয়ে যাওয়ার রসদ পেয়েছে। বঙ্গজননীর ক্রোড় আলো করে জন্মানো এই মহাপুরুষদের মধ্যে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম যিনি পরবর্তীকালের সমাজ ও জনজীবনের চিন্তাস্রোতকে ব্যাপকভাবে ত্বরান্বিত করেছিলেন।

৩.১. ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবন

১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জুন এই বঙ্গদেশে অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত কাঁটালপাড়ায় এই মহান ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মাতা দুর্গাসুন্দরী দেবী। শৈশব থেকেই ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী বালক বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে ছয় বৎসর বয়সে সেখানকার ইংরাজি স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট মাসের দিকে শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন। তৎকালীন লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নরের আদেশে যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টররূপে তিনি নিযুক্ত হন। কর্মস্থলের বেশ কয়েকবার স্থানান্তর ঘটে তাঁর জীবনে। শরীর ও স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর স্বাস্থ্যের ভগ্নদশা প্রকট হয়। ঐবছরই এপ্রিল মাসের দিকে শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতি হতে হতে ৮ই এপ্রিল ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

৩.২. রচনাসম্ভার

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী বাংলা গদ্যসাহিত্যকে এক দীর্ঘ সৌষ্ঠব দান করেছিল। বিশেষত গদ্য রচনাগুলিকেই নির্দেশ করে তাঁর রচনাসম্ভারে উপন্যাস ও প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির কথা উল্লেখ করতে হয়।

উপন্যাস গুলির মধ্যে উল্লেখ্য- 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪) প্রভৃতি। অপরদিকে, প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ্য- 'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫), 'বিবিধ প্রবন্ধ' [প্রথম ভাগ (১৮৮৭) ও দ্বিতীয় ভাগ (১৮৯২)], 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৯২) প্রভৃতি।

৩.৩. প্রবন্ধসাহিত্য ও বঙ্কিমচন্দ্র

প্রবন্ধ কাকে বলে? এই প্রশ্নের কোনও চটজলদি উত্তর দেওয়া কঠিন ব্যাপার কারণ কাব্য, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি সাহিত্যরূপগুলির যেমন একটি নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট লক্ষণ আছে, প্রবন্ধের সেইরূপ সুস্পষ্ট লক্ষণ নির্দেশ করা যায় না। কারও মতে একটি বিষয় যখন স্বল্পকথায় যুক্তিঋদ্ধভাবে প্রকাশিত হয়ে বক্তব্যকে পেশ করে, তখন তাকে বলে প্রবন্ধ।[১]

একেবারে প্রাথমিক স্তরে, প্রবন্ধকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে- বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধ ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে আত্মগত দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিহৃদয়েরই প্রাধান্য। অপরদিকে বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর প্রাধান্যই মুখ্য। এবং এই বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধগুলিকে আবার আপাতভাবে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে- বিবৃতিমূলক (যেমন ঐতিহাসিক বা সাময়িক ঘটনাশ্রিত), বর্ণনামূলক (যেমন রাষ্ট্র, সমাজ বা বিজ্ঞানাশ্রিত), তত্ত্বমূলক (যেমন ধর্ম, দর্শনাশ্রিত) ও ব্যাখ্যামূলক (যেমন শিক্ষা, সাহিত্যাশ্রিত)। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগ্রন্থগুলির বেশিরভাগ বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধ।

৩.৪. বঙ্কিম-দৃষ্টিকোণে ‘সাংখ্যদর্শন’

ভারতীয় আস্তিকদর্শন পরম্পরার একেবারে প্রথম প্রচেষ্টাস্বরূপ যে সাংখ্যমত বা সাংখ্যদর্শন, সেই সাংখ্যের উপর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। এর প্রমাণ ‘সাংখ্যদর্শন’ প্রবন্ধ। যদিও প্রবন্ধের উপক্রমণিকায় প্রাবন্ধিকের এতাদৃশ মনোযোগ কিঞ্চিৎ অভিযোগের সুরেই- “এদেশীয় প্রাচীন দর্শন সকলের মধ্যে বঙ্গদেশে ন্যায়ের প্রাধান্য। দেশীয় পণ্ডিতেরা সচরাচর সাংখ্যের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ করেন না”।[২] প্রাবন্ধিকের অভিযোগ অমূলক নয়। সাংখ্যের প্রধানসারির ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে এদেশীয় পণ্ডিত খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুষ্কর। তবুও অন্যান্য দর্শন-পরম্পরার মত সাংখ্য তার প্রাচীনত্বের শিরোপা নিয়ে বিদ্যমান। এই প্রাচীনতা সাংখ্যের অসারতা নয়, সুবিস্তৃত দর্শনারণ্যে প্রোথিত বনস্পতির পরিচায়ক। প্রাবন্ধিক যথার্থই বলেছেন- “যাহা প্রাচীন, তাহাই যে উপধর্মকলঙ্কিত বা সর্বজনপরিজ্ঞাত, এমন মনে করিবেন না। বিবেচক দেখিবেন, সাংখ্যদর্শনে একটু সারও আছে। অসার বৃক্ষে এমন স্থায়ী ফল ফলিবে কেন”?[৩] যাইহোক, প্রাবন্ধিকের এই উদ্যোগ স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্য পরিসরে বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

৩.৪.১. ভারতবর্ষে সাংখ্যের গতিপথ

নানা বেশ, নানা ভাষা, নানা জাতি, নানা পরিধানের সমাবেশস্থল এই ভারতভূমিতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐকতানের খোঁজ চলতেই থাকবে কিন্তু বর্তমান সমাজের পূর্বকালীয় গতির পরিচয় পেতে হলে এবং সেই সমাজের সামাজিকদের চরিত্রের অনুসন্ধান করতে হলে সাংখ্যদর্শন সম্যক্‌রূপে বুঝতে হবে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সংসারের দুঃখময়তার কথা সাংখ্যের কল্যাণেই ভারতীয় সমাজে সুবিদিত- “সংসার যে দুঃখময়, দুঃখ নিবারণমাত্র আমাদিগের পুরুষার্থ, একথা যেমন হিন্দুজাতির হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, এমন বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই। তাহার বীজ সাংখ্যদর্শনে”।[৪]

ভারতবর্ষের তান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের ধারা যে পরিমাণ অগ্রসর হয়েছে, সেই গতিপথের মূলে আবার সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ। আজ শক্তির আরাধনা থেকে শুরু করে দেশব্যাপী যে তন্ত্রসাধনার বাড়বাড়ন্ত, তার মূলে কিন্তু সাংখ্য। প্রাবন্ধিকের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের বহিঃপ্রকাশ- "সেই তন্ত্রের কৃপায় বিক্রমপুরে বসিয়া নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঠাকুর অপরিমিত মদিরা উদরস্থ করিয়া, ধর্মাচরণ করিলাম বলিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেছেন। সেই তন্ত্রের প্রভাবে প্রায় শত যোজন দূরে ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে কাণফোঁড়া যোগী উলঙ্গ হইয়া কদর্য্য উৎসব করিতেছে। সেই তন্ত্রের প্রসাদে আমরা দুর্গোৎসব করিয়া এই বাঙ্গালা দেশের ছয় কোটি লোক জীবন সার্থক করিতেছি"।[৫] এই প্রভাব কতখানি ভালো বা খারাপ সে বিচারের জায়গা অন্যত্র কিন্তু প্রভাবের মাত্রা যে অনেকখানি সেবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

৩.৪.২. প্রসঙ্গ: দুঃখপ্রাধান্য

চলমান এই সংসার সুখের অথবা দুঃখের তা নিয়ে বাদ-বিতণ্ডার অন্ত নেই। এক এক পক্ষ এক এক দৃষ্টিকোণ থেকে সংসারের সুখময়তা বা দুঃখময়তা পর্যালোচনা করেছেন। প্রাবন্ধিকও সর্বাগ্রে সংসারে সুখের প্রাধান্য বেশি বা দুঃখের, সেই নির্ধারণে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রাবন্ধিক সুখ-দুঃখের এই অস্থিরতার যথাযথ বিচারে সচেষ্ট হয়ে যুক্তি-প্রতিযুক্তির সাথে সাথে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে এক প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করেছেন। যেমন, যারা সুখসর্বস্ববাদী তারা বলতে পারেন স্রষ্টার কৃত নিয়মের পালনে দুঃখের কোনও অবকাশ থাকে না। নিয়মের লঙ্ঘনেই দুঃখের প্রবৃত্তি। যদিও প্রতিযুক্তিরূপে বলা যায়, এমন নিয়মের যৌক্তিকতা কোথায় যে নিয়ম অতি সহজেই লঙ্ঘন করা যায়। দৃষ্টান্তরূপে বলা যেতে পারে- মাদকের সেবন মানুষের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়ানক। একথা আপামর জনগণের নিকট সুবিদিত। অথচ পরিহাসের কথা এই যে, মাদক সেবনের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহের অন্ত নেই। এমনকি এই দ্রব্য সেবনের আয়াস ও প্রয়াস অত্যন্ত সুলভ। তাহলে দেখা গেল, মাদক সেবন ক্ষতিকর এইরূপ নিয়ম থাকলেও তা অতি অনায়াসেই লঙ্ঘনীয়। এবং তারই ফলস্বরূপ দুঃখের প্রবৃত্তি।

৩.৪.৩. প্রসঙ্গ: দুঃখনিবৃত্তি

সংসার এতাদৃশ দুঃখময়। দুঃখের এই বহমানতা থেকে আত্যন্তিক নিবৃত্তিতেই পরমপুরুষার্থ লাভ। কিন্তু দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা দুঃখ নিবারণ কাকে বলে? সাধারণভাবে দেখা যায় জীব দুঃখের কবলে পড়লে সেই দুঃখ হতে উদ্ধারের চেষ্টা করে। বস্তুত জীবমাত্রেরই তা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যেমন- ক্ষুধায় কষ্ট পেলে ব্যক্তি আহারের দ্বারা তার নিবৃত্তিতে সচেষ্ট হয়। পুত্র বা পত্নী বিয়োগজাত শোকের কষ্ট অন্যবিষয়ে মনোনিবেশের দ্বারা উপশমের প্রয়াস করে। যদিও এই উপায়গুলি বড়ই ক্ষণিক। কারণ ক্ষুধার প্রবৃত্তি পুনরায় হবে এবং অন্য বিষয় হতে মনের স্থানান্তর ঘটলেই পুনরায় শোক জন্মাবে। সুতরাং ক্ষণিক উপায়গুলি কখনই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে সক্ষম নয়।

বস্তুত যা কিছু দুঃখ সেই সবই প্রকৃতিঘটিত অর্থাৎ যেকোনও দুঃখই হোক না কেন, তার মূল কিন্তু বাহ্য পদার্থ। যেমন একজনের বাক্যে অন্য একজন অপমানিত হল। এখানে যিনি দুঃখ পেলেন তিনি মানসিক দুঃখ পেলেন, সন্দেহ

নেই; কিন্তু যার দ্বারা দুঃখ পেলেন অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা সেই বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ। তাহলে সবরকম দুঃখের মূলেই সেই প্রকৃতি।

প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগই যে পুরুষে দুঃখ বর্তানোর কারণ সেকথা পূর্বে প্রতিপন্ন হয়েছে। ঐ সংযোগের উচ্ছেদই অপবর্গ বা মোক্ষ। তবে ঐ সংযোগের উচ্ছেদ সম্ভব কি? উত্তর হচ্ছে সম্ভব। কেননা প্রকৃতি-পুরুষের ঐ সংযোগ কোনও নিত্য সংযোগ নয়। আর কীভাবে ঐ উচ্ছেদ সম্ভব? 'বিবেক' এর দ্বারা। বিবেক অর্থাৎ জ্ঞান। প্রকৃতি-পুরুষ সম্বন্ধীয় ভেদজ্ঞানের দ্বারাই অপবর্গ বা মুক্তিলাভ সম্ভব। প্রাবন্ধিক যদিও সর্বান্তঃকরণে 'জ্ঞানেই মুক্তি' একথা স্বীকার করে নিতে পারলেন না। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার 'শক্তি' ও হিন্দুসভ্যতার মূল কথা 'মুক্তি'- দুই জাতির দুটি পৃথক্ উদ্দেশ্যানুসন্ধানে একই পথে যাত্রার পৃথক্ ফল হয়েছে এরূপ প্রবন্ধকার মনে করেন।

৩.৪.৪. সৃষ্টি

সৃষ্টিতত্ত্ব ভারতীয় দর্শন পরম্পরায় অত্যন্ত সমাদরের সাথে আলোচিত। জগৎ-সংসার অনাদিকাল থেকে অবস্থান করছে নাকি নির্দিষ্ট ক্রিয়া-পক্রিয়ায় সৃষ্ট হয়েছে, তা নিয়ে আস্তিক ও নাস্তিক উভয় সম্প্রদায়ই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেই প্রশ্নের সমাধানও তাঁরা রেখেছেন সকলের সামনে।

বিবাদ-বিসংবাদ এড়িয়ে প্রাবন্ধিক সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। জগদুৎপত্তির আদিম-কারণ রূপে সাংখ্যকার স্বীকার করেন মূল-প্রকৃতিকে। কারণ পরম্পরার অনুসন্ধানে ব্যাপ্ত হলে একস্থলে সেই কারণপরম্পরার অন্ত হয়। জগৎ উৎপত্তির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রাবন্ধিক একটি সরল দৃষ্টান্তের উপস্থাপন করেছেন- "আমি যে ফলটি ভোজন করিতেছি, ইহা অমুক বৃক্ষে জন্মিয়াছে; সেই বৃক্ষ একটি বীজে জন্মিয়াছে; সেই বীজ অন্য বৃক্ষের ফলে জন্মিয়াছিল; সেই বৃক্ষও আর একটি বীজে জন্মিয়াছিল। এইরূপে অনন্তানুসন্ধান করিলেও অবশ্য একটি আদিম বীজ মানিতে হইবে। এইরূপ জগতে যাহা আদিম বীজ, যেখানে কারণানুসন্ধান বন্ধ হইবে, সাংখ্যকার সেই আদিম কারণকে মূল প্রকৃতি বলেন"।[৬] আদি কারণ মূল-প্রকৃতি হতে জগৎ সংসারের এই রূপাবয়বাদি প্রাপ্তি এবং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের মধ্যে সকল জাগতিক পদার্থের অন্তর্ভুক্তি। প্রাবন্ধিক এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সম্পর্কে অধিক বিস্তারের চেষ্টা করেননি কারণ তাঁর স্পষ্ট মত- "এ তত্ত্বের আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। একালে ইহা বড় সঙ্গত বা অর্থযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না"।[৭]

৩.৪.৫. প্রসঙ্গ: ঈশ্বর

সাংখ্য সেশ্বর না নিরীশ্বর এ নিয়ে বিবাদের অন্ত নেই। একদল মনে করেন সাংখ্যে ঈশ্বর স্বীকার করা হয়েছে, আবার অন্যদল মনে করেন সাংখ্যে ঈশ্বর স্বীকার করা হয়নি। সাংখ্য-পরম্পরার পরবর্তী ধারক-বাহক তথা অন্যান্য ব্যাখ্যাতারা নিজ নিজ ব্যাখ্যা বুদ্ধির অবসরে কাপিলমতকে বিশ্লেষণ করে সেশ্বরতা বা নিরীশ্বরতার আশ্রয় নিয়েছেন। সচরাচর দর্শনশাস্ত্রে নিরীশ্বরবাদীরা বহুস্থলে নিন্দিত। ঈশ্বর স্বীকারের বা অস্বীকারের সাথে মোক্ষরূপ সেই মূল লক্ষ্যের সরাসরি

যোগ বা বিয়োগ নেই। তথাপি তাবড় প্রথিতযশা দার্শনিক যাদের মত অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে গৃহীত ও আদৃত হয়েছে তাদের সকলেই ঈশ্বর স্বীকার করেন। বিচার করলে দেখা যাবে মহর্ষি কপিলের মত অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সমাদরের সাথেই গৃহীত হয়েছে সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। অথচ মহর্ষি কপিল তো নিরীশ্বরবাদীরূপেই প্রসিদ্ধ। তাই সাংখ্যে সেশ্বরতার নাকি নিরীশ্বরতার প্রাধান্য সেই ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসা থেকেই যায়। সাংখ্য সেশ্বর অথবা নিরীশ্বর এই দ্বন্দ্বে সেশ্বরপক্ষে প্রাবন্ধিক অন্তত চারজনের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন ডাক্তার, মক্ষমূলর (Maxmüller), আচার্য উদয়ন ও আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু।

ডাক্তার বলতে কাকে বোঝাতে চেয়েছেন তা প্রবন্ধে স্পষ্ট নয়। তবে আমাদের অনুমান ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কথা প্রাবন্ধিক বলতে চেয়েছেন। তার কারণ দু'টি। প্রথমত, সেই সময় ভারতবিদ্যা চর্চায় তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক স্বরূপ। দ্বিতীয়ত, পতঞ্জলি বিরচিত যোগ সূত্রের উপর তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে ঈশ্বর সম্পর্কে আলোচনা দৃষ্ট হয়। যোগদর্শনে 'ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ' (*যোগসূত্র* ১/২৪) ইত্যাদি সূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি ঈশ্বর প্রসঙ্গে আলোচনাবসরে উল্লেখ করেছেন যে কপিল মতাবলম্বীরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না।

নিরীশ্বরপক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণের অভাব দেখানো হচ্ছে। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" (*প্রবচনসূত্র* ১/৯২)[৮] ইত্যাদি সাংখ্যসূত্রোদ্ধার করলে বোঝা যায় ঈশ্বর অসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরসিদ্ধির কোনও প্রশ্নই আসে না। অন্যদিকে অনুমান তখনই সম্ভব যখন দুটি বস্তুর মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ থাকে। প্রাবন্ধিক এক সহজ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, "যদি তোমায় জিজ্ঞেস করি তোমার প্রপিতামহের প্রপিতামহের কয়টি হাত ছিল তুমি বলিবে দুইটি। তুমি তাঁহাকে কখন দেখ নাই তবে কি প্রকারে জানিলে তাঁহার দুইটি হাত ছিল? বলিবে মানুষমাত্রেরই দুই হাত, এই জন্য। অর্থাৎ মানুষত্বের সহিত দ্বিভুজতার নিত্য সম্বন্ধ আছে এই জন্য"।[৯] তাহলে দুটি বস্তুর মধ্যে থাকা নিত্য সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিই অনুমানের একমাত্র কারণ। যেমনভাবে অগ্নির সাথে ধূমের নিত্য সম্বন্ধ আছে বলে পর্বতে ধূম দেখে অগ্নির অনুমান করা যায় তেমনভাবে ঈশ্বরের সাথে ইহজগতের কোনও বস্তুর নিত্য সম্বন্ধ নেই, যা থেকে ঈশ্বরের অনুমান করা চলে। অতএব অনুমানের দ্বারাও ঈশ্বর সিদ্ধির প্রশ্ন নেই। আর রইল শব্দ প্রমাণ। আপ্তবাক্যকে শব্দ বলা হয়। আপ্তবাক্য এক অর্থে বেদবাক্য। কিন্তু সাংখ্যকার মনে করেন বেদে যে ঈশ্বরের উল্লেখ তা হয় কোনও মুক্তাত্মার প্রশংসা কিংবা কোনও সিদ্ধের উপাসনা। এইভাবে নিরীশ্বরপক্ষ অবলম্বনকারীরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণের অভাব বোধ করেন।

৩.৫. উপসংহার

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন পরিপূর্ণরূপে গৃহী। স্বাভাবিকভাবেই প্রবৃত্তির একেবারে ধ্বংস তিনি চাননি। তবে জীবনের অভাববোধ থেকেই এমন তাৎপর্য খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছেন যা তার গতিপথকে ঊর্ধ্বায়িত করে। তত্ত্ব (theory) ও প্রয়োগ (application) এই দুই ধারার মধ্যে তিনি দৃঢ়ভাবে দ্বিতীয় মার্গের কথা বলেছেন। "হিন্দু দর্শনকে দুভাবে পড়া যেতে পারে- শুধুই তত্ত্বের জন্য অথবা ভারতীয় ইতিহাসের গতিকে বোঝার জন্য। যে চিন্তা জাতীয় সমাজের পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করছে, সেটাই জানা এখন আমাদের দরকার হয়ে পড়েছে।

নিছক তত্ত্বের জন্য হিন্দু দর্শন পড়ার দরকার আছে বলে মনে হয় না"।[১০] একথা বোধগম্য হয় যে, ভারতীয় সমাজের তাৎকালিক গতিকে উপলব্ধির অভিপ্রায়েই সম্ভবতঃ তিনি সাংখ্যের ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করেছিলেন। যথেষ্ট আধুনিক ও স্পষ্টদৃষ্টিতে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর 'লক্ষ্য পাঠক' (target reader) পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং "এই শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলেও তাহা বুঝিতে পারেন না"।[১১] পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বশবর্তী হওয়ায় প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা-প্রণালী ঐ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অপরিচিত। তাই "তাঁহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, পাশ্চাত্য ভাবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়"।[১২] সুপ্রাচীন অতীত আদর্শের কার্যকারিতা, বর্তমান গতিময় সময়ে অক্ষুণ্ণ থাকতে নাও পারে? তাই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি খুব স্পষ্ট- "Let us revere the past, but we must, in justice to our new life, adopt new life, adopt new methods of interpretation and adopt the old eternal and underlying truths to the necessities of that new life".[১৩]

উল্লেখপঞ্জি

[১] অশোক কুমার মিশ্র, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস* (আধুনিক পর্ব), পৃ. ২৬৪

[২] *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড (সম্পা. যোগেশ চন্দ্র বাগল), পৃ. ২২১

[৩] *তদেব*, পৃ. ২২৪

[৪] *তদেব*, পৃ. ২২২

[৫] তত্রৈব

[৬] *তদেব*, পৃ. ২২৭

[৭] তত্রৈব

[৮] জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (সম্পা.), *সাংখ্যদর্শনম্ (অনিরুদ্ধকৃতবৃত্তিসহিতম্)*, পৃ. ২৬

[৯] *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড (সম্পা. যোগেশ চন্দ্র বাগল), পৃ. ২২৯

[১০] ভবতোষ দত্ত, *চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র*, পৃ. ১৫

[১১] *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড (সম্পা. যোগেশ চন্দ্র বাগল), পৃ. ৬৮০

[১২] তত্রৈব

[১৩] অরবিন্দ পোদ্দার, *বঙ্কিম-মানস*, পৃ. ৯০

চতুর্থ অধ্যায়

"The Sāmkhya philosophy of Kapila was the first rational system that the world ever saw. Every metaphysician in the world must pay homage to him. I want to impress on your mind that we are bound to listen to him as the great father of philosophy"

-Swami Vivekananda (*The Complete Works of Swami Vivekananda*, Vol.2)

সাংখ্যের ঐতিহ্যানুসন্ধানে স্বামী বিবেকানন্দ

"I want this to be clear, because it is the stepping-stone to Sankhya and it is absolutely necessary for you to understand it because this is the basis of the philosophy of the world. There is no philosophy in the world that is not indebted to Kapila".

-Swami Vivekananda (*The Complete Works of Swami Vivekananda*, Vol.2)

৪.০. ভূমিকা

মানব সমাজ দীর্ঘদিন যাবৎ একপ্রকার ছাঁচে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করে আসছে। সমাজ, সংস্কার, প্রথা, বিশ্বাস- এই সবই মানব জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকে। তবে, এই বহমানতায় মাঝে মাঝে আপাদ-মস্তক ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন দেখা দেয় কারণ দীর্ঘদিনের ক্লেদ, গ্লানি, জীর্ণতা সমাজের গতিপথকে অবরুদ্ধ করে ও সমাজে বাস করা সামাজিকদের ভগ্নস্তূপে পরিণত করে। সেই ভগ্নস্তূপ থেকেই 'ফিনিক্স' পাখির মত নব কলেবরে তথা নব উদ্যমে সমাজকে জাগিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন হয় কোনও ক্ষণজন্মা সংস্কারকের বা যুগ-প্রবর্তকের বা মানবহিতৈষীর। বঙ্গজননীর ক্রোড়ে আবির্ভূত এরকমই এক ক্ষণজন্মা হলেন স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি অমিত-প্রভাবে সমাজের অজ্ঞানের আবর্জনাগুলিকে জ্ঞানের সন্মার্জনী দিয়ে দূরে সরিয়ে ধর্ম ও সমাজকে এক নতুন রূপ প্রদান করেন এবং বঙ্গদেশের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন।

৪.১. ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবন

তদানীন্তন 'কলিকাতা' শহরের শিমুলিয়ায় বিখ্যাত দত্ত বংশে, ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী এই মহান পূণ্যাত্মার আবির্ভাব হয়। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন একেবারে প্রগতিশীল চিন্তাধারার ব্যক্তি। কোনওরকম গোঁড়ামির লেশমাত্র ঐ উদারচেতা মানুষটির মধ্যে ছিল না। অপরদিকে, মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন প্রাচীনপন্থী তবে অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণা। স্বাভাবিকভাবেই, পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে এই প্রাচীন-অর্বাচীন ধারার সুষম সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

১৮৮৮ সাল থেকে ১৮৯২ সাল অবধি তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করলেন। দীর্ঘ ভারত ভ্রমণে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এই সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা সমাজের আর্ত, নিপীড়িত, ব্যথিতদের মধ্যে বিতরণ করে তাদের উদ্ধার করতে ব্রতী হয়েছেন স্বামীজি । এরপর দীর্ঘসময় পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত থেকে হিন্দুধর্ম তথা মানবধর্মকে এক উচ্চকোটির মাত্রায় স্থাপন করেন।

অক্লান্ত পরিশ্রম ধীরে ধীরে স্বামীজির ঐ নশ্বর দেহটিকে গ্রাস করতে থাকল। সিদ্ধপুরুষ সেসবের ভ্রূক্ষেপ না করে নিজব্রতে অটল রইলেন। মধ্যে মধ্যে বায়ু পরিবর্তনের জন্য স্থান পরিবর্তন হল কিন্তু ক্লান্তি ক্রমশই স্তূপীকৃত হতে থাকল। অবশেষে ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই, স্বামীজি তাঁর কর্মস্রোতের আশ্রয় বেলুড় মঠে, কর্মবিরতি নিয়ে অনন্ত নিদ্রায় শায়িত হলেন।

৪.২. রচনাসম্ভার

একজন মহান ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করার মূল উপাদান কী? নির্বিবাদে বলা যেতে পারে তাঁর 'চিন্তা-ভাবনা'। আর, চিন্তা-ভাবনা সাধারণত প্রতিফলিত হয় সেই ব্যক্তির বাণী ও রচনার মধ্যে দিয়ে।

তর্ক-বিতর্ক তথা যুক্তি-প্রতিযুক্তির চড়াই-উতরাইয়ে, উপলব্ধ বাণী ও রচনার সেই সুবিশাল সংকলন এযাবৎ কাল অবধি বিবেক-মনীষার পরিচয় বহন করে আসছে। বিবেক-বাণী ও রচনার মৌলিকত্ব নিয়ে বিতর্ক থাকলেও সেই বিতর্কের ইতি টেনে আপাতত সেই সুবিশাল রচনাসম্ভারের পরিচয় উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস করা যেতে পারে।

বিভাগ ১: বক্তৃতা, বিভাগ ২: আলাপচারিতা, বিভাগ ৩: পুস্তক/পুস্তিকা, বিভাগ ৪: প্রবন্ধ, বিভাগ ৫: কবিতা-স্তোত্র, বিভাগ ৬: চিঠিপত্র, বিভাগ ৭: সঙ্গীত

৪.৩. প্রবন্ধসাহিত্য ও বিবেকানন্দ

সাহিত্যক্ষেত্রে একজন লেখকের ব্যক্তিগত ভাব প্রকাশের বা জ্ঞানের পরিস্ফুরণের যতরকম মাধ্যম আছে বা উপায় আছে, তার মধ্যে প্রবন্ধই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাধ্যম। এর কারণ সম্ভবত প্রত্যক্ষতা তথা অন্তরঙ্গতা। অধীর দে মহাশয় *Compton's Pictured Encyclopedia* থেকে উদ্ধার করেছেন, "…unlike the novel or the short story or the drama, the essay does not aim primarily to create characters and through them to tell the story. It speaks directly to the reader, giving the author's views on customs or happenings or people, on art, on books or on life in general. It may teach, argue, persuade, arouse emotion or merely amuse".[১] পাঠকের সাথে অন্তরঙ্গতার কারণেই জ্ঞানগর্ভ বিষয়েও লেখকের ভাব ও ভঙ্গিমা স্বচ্ছন্দভাবে প্রকাশ পায়।

স্বামীজি রচিত মৌলিক প্রবন্ধের সংখ্যা চারটি- 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (The East and The West), 'পরিব্রাজক' (Memories of European Travel), 'বর্তমান ভারত' (Modern India) এবং 'ভাববার কথা' (Matter for serious thought)। স্বামীজির প্রবন্ধগুলিতে তার মননশীলতা, বিশ্লেষণ-শক্তি ও ভূয়োদর্শিতার পরিচয় স্পষ্ট। সাহিত্যসমালোচক ক্ষেত্র গুপ্ত মনে করেন, স্বামীজির মননশীলতা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতাতে সমাজচেতনা যতটা ফুটে উঠেছে ততটা সেই সময়ের কারও লেখাতে প্রকাশিত হয়নি।[২]

৪.৪. বিবেক মননে সাংখ্য দর্শন

ভারতবর্ষের মাটিতে বেদান্তের সুদীর্ঘ ইতিহাস সুপ্রোথিত ও আপন মহিমায় ভাস্বর। তথাপি বেদান্তের প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য যাত্রায় এবং সমগ্র বিশ্বব্যাপী এক অসামান্য আবেদন সৃষ্টি করার পিছনে যিনি অন্যতম কারিগর ছিলেন তিনি বেদান্ত-পুরুষ বিবেকানন্দ। বেদান্তের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতীয় আস্তিক দর্শনগুলির প্রথম প্রয়াসরূপ সাংখ্যদর্শনের মহত্ত্ব। স্পষ্টবক্তা বিবেকানন্দ একথা সর্বসমক্ষে স্পষ্ট করেছেন যে সাংখ্যদর্শনই হল বেদান্তের উপলব্ধিতে 'stepping stone' বা প্রথম পদক্ষেপ- "I want this to be clear, because it is the stepping-stone to Sankhya and it is absolutely necessary for you to understand it because this is the basis of the philosophy of the world. There is no philosophy in the world that is not indebted to Kapila" {এই বিষয়টি আমি স্পষ্টভাবে আপনাদিগকে বুঝাইতে চাই, কারণ ইহা বেদান্ত বুঝিবার পক্ষে প্রথম সোপান স্বরূপ। আর ইহা আপনাদের জানা একান্ত আবশ্যক, কারণ ইহাই সমগ্র জগতের বিভিন্নপ্রকার দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি। জগতের এমন কোন দর্শনশাস্ত্র নাই, যাহা এই সাংখ্যদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কপিলের নিকট ঋণী নয়}।[৩]

৪.৪.১. প্রস্তাব: প্রকৃতি

বেদান্তের আলোচনার পথ সুগম করতে স্বামী বিবেকানন্দ সাংখ্যের প্রেক্ষাপট আলোচনায় সর্বাধিক মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, বেদান্ত সাংখ্যের প্রতিবন্ধক নয়, তা পরিপূরক। সাংখ্যের অপ্রাশস্ত্যের স্থলে বেদান্ত বাধা সৃষ্টিকারক নয় বরং সেই পথের 'লুপহোল'গুলির মেরামত কারক।

প্রকৃতির লক্ষণ স্পষ্টতই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি শক্তির সাম্যাবস্থা। আকর্ষণরূপ তমঃ ও বিকর্ষণরূপ রজঃ যখন সংযমরূপ সত্ত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ সংযত হয় তথা সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থার কারণে কোনওরূপ সৃষ্টি বা বিকার থাকে না, তখন সেই অবস্থাকে প্রকৃতি বলা হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই শক্তিত্রয়ের প্রতিনিয়ত সাম্যাবস্থা ও বৈষম্যাবস্থার দরুণই প্রকৃতি থেকে নূতন সৃষ্টির উপক্রম হয়। স্বামীজি প্রসঙ্গক্রমে, সাংখ্যের প্রকৃতির দুইটি মাত্রার (*dimension*) কথা বলেছেন। তাঁর মতে আর পাঁচজন যে অর্থে *nature* বা প্রকৃতি বোঝে সেই অর্থে প্রকৃতি সমার্থক। অন্যদিকে, অপেক্ষাকৃত পারিভাষিক নাম অব্যক্ত। অব্যক্ত অর্থাৎ অপ্রকাশিত। এই অব্যক্ত-প্রকৃতি হতেই অনু-পরমাণু, জড়বস্তু, মন-বুদ্ধি তথা সকল পদার্থের উৎপত্তি।[৪]

স্বামীজি এক পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণাপূর্বক দেখিয়েছেন প্রকৃতির একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষের স্বরূপে আরোপ। কাহিনীটি এইরূপ যে, দেবরাজ ইন্দ্র একসময় শূকরের রূপ ধারণ করে একটি কর্দমাক্ত জায়গায় একটি শূকরী ও অনেকগুলি শাবকসহ বাস করতে থাকেন। বাকি দেবগণ দেবরাজকে স্বর্গে ফিরে যাবার অনুরোধ করতে আসলে তিনি তাদের যথারীতি ফিরিয়ে দেন। দেবতারা মনস্থির করলেন শূকরী ও শাবকগুলিকে হত্যা করার। শূকরী ও সেই শাবকগুলি নিহত হলেও দেবরাজ স্বস্বরূপটি স্মরণ করতে পারলেন না। শোকে কাতর হয়ে বিলাপ করতে শুরু করলেন। পুরুষ বা আত্মাও এইরূপে প্রকৃতির সাথে মিলিত হয়ে তাঁর শুদ্ধ ও অনন্ত স্বরূপটি বিস্মৃত হন। সুতরাং প্রকৃতির উদ্দেশ্য পুরুষের স্বরূপে আরোপ।

৪.৪.২. প্রস্তাব: পুরুষ

সাংখ্যমতে মূল প্রকৃতি ও প্রকৃতি হতে সৃষ্ট মহদাদির পারে স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করছেন পুরুষ। এই পুরুষ নির্গুণ তথা সর্বব্যাপী আত্মা। সেইটি কীরকম? একটি স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকট লাল ফুল রাখলে স্বচ্ছ স্ফটিকটি লাল বর্ণ প্রাপ্ত হয়। এরূপ আত্মা সর্বদাই স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় কিন্তু এই আত্মা যেরূপ মনের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ বিকশিত হয়।

স্বামীজি সাংখ্যের মনস্তত্ত্বের এই দিকটি তুলে ধরেছেন এবং বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেছেন দৃষ্টান্ত সহযোগে। বিষয়জ্ঞানে তথা অনুভূতিতে, কোনও কিছু দেখার সময় প্রথমেই রয়েছে দেখার যন্ত্র চোখ। চোখের পিছনে কার্যকরী ভূমিকা চোখের স্নায়ু ও স্নায়ুকেন্দ্রের। প্রকৃতপক্ষে চক্ষুযন্ত্রটি ইন্দ্রিয় নয়, তার পশ্চাতে থাকা এই স্নায়ু ও স্নায়ুকেন্দ্রই প্রকৃত ইন্দ্রিয়। তবে অনুভূতিতে শুধু যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় থাকলেই চলে না; প্রয়োজন ইন্দ্রিয়ের সাথে মনের সংযোগের। শুধু তাই

নয়, এর পরেও প্রয়োজন নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি বুদ্ধির কারণ বুদ্ধির নিকট হতে প্রতিক্রিয়ার পরেই বহির্জগৎ প্রতিভাত হয়। কিন্তু তাতেও সবটা সম্পূর্ণ হয় না। সম্পূর্ণতার জন্য প্রয়োজন হয় একটা স্থির কিছুর যেটি মনের তুলনায় স্থির। এই স্থির পদার্থটিই পুরুষ বা আত্মা।

অতএব পুরুষ সাক্ষী স্বরূপ। প্রকৃতির সাথে হোক বা প্রকৃতিজাত মহৎ-বুদ্ধি প্রভৃতিতে; পুরুষ কোনওভাবেই তাদের সাথে মিশ্রিত হয় না। পুরুষ সাক্ষী স্বরূপে অবস্থান করে আছে মাত্র। দৈনন্দিন জীবনে 'সোনা গলানোর' একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন[৫] করে স্বামীজি পুরুষ কে একপ্রকার *Catalytic Agent* বলতে চেয়েছেন। সোনার গলনের জন্য সোনার সাথে পটাসিয়াম সায়ানাইড (Cyanide of Potassium) মেশানো হয়। এই পটাসিয়াম সায়ানাইড এমন একটি রাসায়নিক বস্তু যে সোনার গলনে তার ভূমিকা থাকে অথচ সোনার গলনের পর ঐ পটাসিয়াম সায়ানাইড পৃথক থেকে যায়। তার উপর গলনের কোনও প্রভাব পড়ে না। স্বামীজির মতে পুরুষও ঠিক এই প্রকার। পুরুষ কোনওপ্রকারেই প্রকৃতির সাথে মিশ্রিত হয় না।

৪.৪.৩. প্রস্তাব: সৃষ্টি

সাংখ্যোক্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়া স্বীকার করে নিলেও স্বামীজি তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি রেখেছেন। পঞ্চভূত রূপে যে ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এর অবতারণা, সেখানে স্বামীজির ধারণা 'আকাশ'ই অন্যান্য ভূত বা স্থূল জড়গুলির কারণ। বিজ্ঞানের 'ইথার' শব্দটির সাথে আপাত সাদৃশ্য খোঁজ করে আকাশ কে তিনি আদিভূতের শিরোপা দিয়েছেন।

মূল প্রকৃতি যখন অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থান করে, তখন তার মধ্যে স্পন্দনের চিহ্ন থাকে না। এই অবস্থাটি স্পন্দনরহিত। তবে মূল প্রকৃতি যখন স্পন্দনরহিত অবস্থা থেকে স্পন্দিত হয়, তখন প্রাণ আকাশের উপর ক্রমাগত আঘাত করে। এইরূপ ক্রমাগত আঘাতে আকাশ ঘনীভূত হতে থাকে। ক্রমশ আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তিদ্বয়ের প্রভাবে পরমাণু গঠিত হয়। পরমাণু সকল ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে দ্ব্যণুকাদিতে ও সবশেষে বিভিন্ন স্থূলভূতে পরিণত হয়। ঐ স্থূলভূত গুলি থেকেই জাগতিক পদার্থসমূহের সৃষ্টি। অতএব, দৃশ্যজগতে যা কিছু গতি বা শক্তি তা 'প্রাণে'র বিকার, অন্যদিকে যা কিছু জড় বা আকৃতিযুক্ত তা 'আকাশে'র বিকার। প্রকৃতির সাম্যাবস্থা প্রকৃতপক্ষে গতিহীন অবস্থা কারণ সামঞ্জস্যে সাধারণত কোনও গতি থাকে না। অতএব এই চরাচর বিশ্বে যা কিছু দেখতে বা শুনতে বা অনুভব করতে পারা যায়, তার সবই জড় ও গতির সম্মেলন।

৪.৪.৪. প্রস্তাব: ঈশ্বর

সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী। ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তারা মনে করেননি। এমনকি ইন্দ্রিয়াদি করণগুলির চালনায় নৈয়ায়িক যে আত্মার ইচ্ছা, যত্ন ইত্যাদি ব্যাপার স্বীকার করেন, সাংখ্যেরা আত্মার সেরূপ কর্তৃত্বও স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধনের নিমিত্তই জড় ইন্দ্রিয়গুলির প্রবৃত্তি।[৬]

স্বামীজিও সাংখ্যের এই নিরীশ্বরবাদিতার যুক্তি সাংখ্য প্রদর্শিত পথেই হেঁটে গিয়ে ব্যক্ত করেছেন। প্রথমত, জগৎকারণরূপে আত্মা স্বীকার করলে প্রশ্ন উঠবে আত্মা মুক্ত নাকি বদ্ধ? যদি বদ্ধ হয়, তাহলে বদ্ধ বা বশীভূত হয়ে অর্থাৎ ক্রীতদাসের মত অবস্থান করে বদ্ধ আত্মা কীভাবে সৃষ্টিতে সক্ষম হতে পারে? অপরদিকে মুক্ত আত্মার কোনওরূপ বাসনাই থাকে না; তাহলে তার সৃষ্টিকার্যের প্রয়োজনীয়তাও নেই। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির স্বীকারেই যেখানে সমুদয় সৃষ্টিকার্যের ব্যাখ্যা সম্ভব সেখানে ঈশ্বর বিষয়ে মতবাদ অনাবশ্যক। অতএব, সাংখ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনও অবকাশ নেই।

৪.৪.৫. প্রস্তাব: সাংখ্যমত খণ্ডনেই বেদান্তের সোপান

স্বামীজি ছিলেন বেদান্তের খুব বড় মাপের একজন প্রচারক। তাঁর দৃষ্টিতে সাংখ্যের সিদ্ধান্তগুলি উৎকৃষ্ট হলেও উৎকৃষ্টতর ছিল না একথা হলফ করে বলা চলে; নচেৎ বেদান্তের দোরগড়ায় তিনি উৎকৃষ্টতর সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থিত হতেন না। তাঁর উপলব্ধিতে সাংখ্যের সব প্রস্তাবগুলি নিখুঁত ছিল না কোনওভাবেই; তাই ঐ প্রস্তাবগুলির নিঁখুত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে তিনি সাংখ্যের সিঁড়ি অতিক্রম করে বেদান্তের অট্টালিকায় পদার্পণ করেছেন। একথার প্রমাণ মেলে কাপিল দর্শনের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকারের সময়- "We shall see how the Vedantists grope out out of all these difficulties and reach a perfect solution, and yet all the glory really belongs to S*ā*nkhya. It is very easy to give a finising touch to a building when it is constructed" {আমরা দেখিব, বেদান্তবাদীরা কিরূপে এই সকল আপত্তি ও আশঙ্কা কাটাইয়া নিখুঁত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব গৌরব কপিলেরই প্রাপ্য। সমাপ্তপ্রায় অট্টালিকাকে সমাপ্ত করা অতি সহজ কাজ।}[৭]

৫.০. উপসংহার

ফরাসী প্রকৃতিবিদ ও লেখক *Georges Louis Leclerc, count de Buffon* তাঁর Discours sur le style (Discourse on style) শীর্ষক বক্তৃতায় বলেছিলেন *Le style, cest I'homme mĕme*[৮] যার ইংরাজী ভাষান্তর হয়, The style is the Man himself এবং বাংলা অনুবাদ হয় 'শৈলীই ব্যক্তি'।

উপস্থাপন শৈলীতেই কি ব্যক্তিত্বের সব পরিচয় প্রকাশিত হয়ে যায়? সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাঙ্গণে মহাকবি কালিদাসের উপস্থাপন শৈলীতে রাজা-রাজ্য-রাজবংশের রাজঘরানার ছাপ স্পষ্ট; কিন্তু কে বলতে পারে, সুউচ্চ রাজপ্রাচীর থেকে শতহস্ত দূরে তিনি অবস্থান করতেন না? আবার বাংলা সাহিত্যের আকাশে কবিগুরু রবি ঠাকুরের উপস্থাপন শৈলীতে মানবের নিকট ইহ জগতের অনর্থ-প্রপঞ্চ হতে দূরে যাবার আকুল হাতছানি; অথচ জগৎ-পারের এই মহান দ্রষ্টা জমিদারীর দেখাশোনায় দেনাপাওনার ব্যাপারে অভিনব চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। সুতরাং 'শৈলীই ব্যক্তি' একথা অনেকাংশে সত্য হলেও সর্বৈব সত্য নয়।

তবে এমন দৃষ্টান্ত অবশ্যই আছে যেখানে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ছায়ারূপ হয়েছে উপস্থাপন শৈলী। অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের হুবহু প্রতিফলন ঘটেছে শৈলীতে। 'শৈলীই ব্যক্তি' একথা বলতে বাধ সাধলেও তখন 'ব্যক্তিই শৈলী' বলতে বিশেষ বাধা

হয় না। অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষের কথায়, "এমন লোকও মাঝে মাঝে দেখা যায়, যাঁদের রচনাগত ব্যক্তিত্ব এবং দৈনন্দিন জীবনের ব্যক্তিত্বে কোনো পার্থক্য নেই। অন্তরে ও বাহিরে যে বিদ্যুৎ ও বৈচিত্র্য তাঁরা জীবনে প্রকাশ করেন, তাঁদের রচনায়ও তার অবিকল ছায়াপাত। বাস্তব ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বে তখন কোনো পার্থক্য থাকে না। The style is the Man কথাটিকে ঘুরিয়ে বলা চলে The Man is the style (ব্যক্তিই শৈলী)। বাংলাসাহিত্যে বিবেকানন্দ সেই শ্রেণীর লেখক"।

স্বামীজি ছিলেন পূর্ণতা ও পবিত্রতার উপাসক। স্বামীজি এই পূর্ণতা ও পবিত্রতাকেই সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পবিত্র ভারতীয় দর্শনের পত্র-পল্লব-পুষ্পের সমূহ থেকে পূর্ণ 'বেদান্ত-পারিজাত'কে চয়ন করেছিলেন। কিন্তু একথা তিনি কখনই বিস্মৃত হননি যে, বেদান্তের ক্ষুদ্র চারাগাছ যে উর্বর মৃত্তিকায় প্রোথিত, সেই মৃত্তিকা সাংখ্যের হাতেই প্রস্তুত হয়েছিল। সেইকারণেই, বেদান্ত আলোচনার প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি সাংখ্যপ্রণেতা মহর্ষি কপিলকে স্মরণ করেছেন।

উল্লেখপঞ্জি

[১] অধীর দে, *বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা*, পৃ. ১১

[২] চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও বিবেকানন্দের বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। তিনি ধর্মরাজ্যের মানুষ হলেও তাঁর সমাজচেতনা এবং ইতিহাসবোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। সমাজতান্ত্রিক ভাবনা যত স্পষ্ট করে তাঁর লেখায় প্রকাশিত হয়েছে ততটা সেকালে আর কারও প্রবন্ধে ঘটেনি। (ক্ষেত্র গুপ্ত, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ.১৬৬)

[৩] *The Complete Works of Swami Vivekananda*, Vol.2 (*A Study of the Sānkhya Philosophy*), p.435

[৪] We all use the word nature. The old Sānkhya philosophers called it by two different names, prakriti, which is very much the same as the word nature, and the more scientific name, Avyakta, undifferentiated, from which everything proceeds…[*The Complete Works of Swami Vivekananda*, Vol.2 (*Sānkhya and Vedānta*), p. 423]

[৫] এই দৃষ্টান্ত টি স্বামীজির বাংলা 'বাণী ও রচনা'র ৩য় খণ্ডে (পৃ. ২৫) থাকলেও ইংরাজী *The Complete Works of Swami Vivekananda*, Vol. 1 (p. 441) তে নেই।

[৬] স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পরাকৃত-হেতুকাং বৃত্তিং/পুরূষার্থ এব হেতু র্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্ (*সাংখ্যকারিকা*, ৩১)

[৭] *The Complete Works of Swami Vivekananda*, Vol.2 (*A Study of the Sānkhya Philosophy*), p. 442

[৮] https://www.britannica.com/biography/Georges-Louis-Leclerc-comte-de-Buffon (...He was elected to the French Academy, where on August 25, 1753, he delivered his celebrated *Discours sur le style* {Discourse on Style}, containing the line, *Le style, cest I'homme měme* { *The style is the Man himself }*)

পঞ্চম অধ্যায়

তোমার তরুতে নবীন উল্লাসে ফুটিছে নিয়ত কুসুমদাম
রবে চিরলেখা সাহিত্য কাননে অমর অক্ষরে তোমার নাম

-যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *কুরুক্ষেত্রে দশদিন*, উৎসর্গপত্র

রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-চিন্তনে সাংখ্যদর্শন

প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি তোমাকে আহ্বান করি, নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘজীবনে আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি, বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি।

প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে।
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে।।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা শেষ চিঠি

৫.০. ভূমিকা

বিজ্ঞান ও দর্শন- দুইটিই মানুষের চিন্তার ফসল। বিজ্ঞানে অবশ্যই পরীক্ষা-নিরীক্ষার জায়গা আছে তবে প্রাথমিক আরোহণে চিন্তাই সিঁড়ির জোগান দেয়। এর সাথে যদি সাহিত্যের কথা আসে, তাহলে প্রাথমিকভাবে পাঠক বলবেন সে তো কল্পনা। একেবারে ভুল নয়; আবার সম্পূর্ণ ঠিকও নয়। অলীক হোক বা বাস্তব, কল্পনার স্রোতে উজান আসে চিন্তা থেকেই। একথা অস্বীকার করা চলে না যে বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের পুষ্প একই বৃন্ত থেকে প্রস্ফুটিত না হলেও চিন্তার সুতোয় একসাথে গ্রথিত হয়ে মালারূপে শোভা পেতে পারে। প্রয়োজন শুধু একজন যোগ্য 'মালাকারে'র। সেই মালাকারের ভূমিকা যিনি যথাযোগ্যরূপে পালন করেছিলেন তিনি হলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক সত্তার সংমিশ্রণ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। যার ফলস্বরূপ অনেক অব্যক্ত বিষয় সাহিত্যের রসে সিক্ত হয়ে, বিজ্ঞানের তিক্ততা অতিক্রম করে, দর্শনের মুক্ত পরিসরে ব্যক্ত হয়েছিল।

৫.১. ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবন

১৮৬৪ সালের অগাস্ট ২০শে, জেমোকান্দিতে গোবিন্দসুন্দর ও চন্দ্রকামিনী দেবীর কোল আলো করে আবির্ভূত হন রামেন্দ্রসুন্দর। তাঁর পিতা ছিলেন একজন যথার্থ সাহিত্য অনুরাগী ও স্বদেশপ্রেমিক। গণিত, বিজ্ঞান ও জ্যোতিষে গোবিন্দসুন্দরের প্রগাঢ় অনুরাগ পরবর্তীকালে রামেন্দ্রসুন্দরে সিঞ্চিত হয়। অন্যদিকে চন্দ্রকামিনী দেবী ছিলেন ভক্তি ও প্রীতির মূর্ত প্রতিমূর্তি। তাঁর কর্মজীবনের দুটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রসার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। আর এই দুই কার্যের মধ্যে দিয়ে তিনি বাংলা ভাষার সকল স্তরের অনুরাগীদের জন্য মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির জয়গান গেয়ে গেছেন।

জীবনের সায়াহ্নে উপস্থিত হয়ে এই অক্লান্ত কর্মবীরকে বহুবিধ ব্যাধি ও পীড়ার সম্মুখীন হতে হয়। মৃত্যুর পূর্বে প্রায় পাঁচ-ছয় বছর জুড়ে চলে এই দীর্ঘ ভোগান্তি। অনেকবার বায়ু পরিবর্তন, চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটালেও অবস্থার উন্নতি হয়নি। জীবনব্যাপী কর্মযজ্ঞ চালিয়ে গেলেও বেলাশেষের জীর্ণশরীরে আর কাজ করতে না পারার আক্ষেপ ব্যক্ত হত তাঁর মুখ দিয়ে। ১৯১৯ সালের ৬ই জুন বাগ্‌দেবীর নিষ্ঠাবান মশাল-বাহকের জীবন-মশালের আগুন নিভে গেল। মহাকালের যাত্রাপথে আরও অনেক সাহিত্যকীর্তি ও তাদের স্রষ্টারা এসেছেন বা আসবেন; তবে মাতৃভাষার ও মাতৃভূমির এমন একনিষ্ঠ সাধক জগতে বড়ই দুর্লভ। যে অনুরাগে কোনও ছদ্ম-তোষামোদ নেই, যে প্রয়াসে কোনও লোভ-লোলুপতা নেই, যে ঘোষণায় কোনও ক্ষুদ্র-আমিত্ব নেই, সেই সমূহের নেতা ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর।

৫.২. রচনাসম্ভার

যদি বলা হয় বাংলা সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' দিয়ে ইমারত তৈরি করতে তাহলে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, কারণ প্রাবন্ধিকগণের কলম থেকে প্রবন্ধের অবিরাম-ধারা বয়ে গেছে। কিন্তু যদি বলা হয় কোনও একজন প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধ দিয়ে ইমারত তৈরি করতে! তাহলেও চিন্তার কিছু নেই। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে অনুসরণ করলেই হয়। তিনি এমন

একজন সাহিত্য সাধক যিনি তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য সাধনায় বাংলা ভাষায় একনিষ্ঠভাবে প্রবন্ধের চর্চা করে গেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ থেকে প্রকাশিত ছয় খণ্ডের রামেন্দ্র রচনাবলীতে প্রবন্ধের সংখ্যা আনুমানিক ২১০এর উপরে। এই পরিমাণ বহুবিধ বিষয়ের বহুমুখী আলোচনা কেবলমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। বোধ হয় সেকারণেই শয্যাগ্রস্ত রামেন্দ্রসুন্দরের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত বিপিনবিহারী গুপ্ত বেদনার্ত চিত্তে আন্তরিক অনুযোগ করেছিলেন "ভারতবর্ষে প্রবন্ধের উপর প্রবন্ধ সাজিয়ে আপনি যে জিনিস গড়ে তুল্‌চেন, তা এই সমস্তে ভারতবর্ষে আর কেউ শেষ করতে পারবে না; সে জিনিস অসমাপ্ত রেখে সরে পড়া চলবে না"।[১]

৫.৩. প্রবন্ধসাহিত্য ও রামেন্দ্রসুন্দর

প্রবন্ধের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ রামেন্দ্রসুন্দরের মৌলিক প্রবন্ধের সংখ্যা আনুমানিক দুইশত'র বেশি। এরূপ বললে বোধ হয় অতিরঞ্জন হয় না, রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধরাশি এতই ব্যাপক ও বিস্তৃত যে তা এই বিভাগের অনেক ঊর্ধ্বে। বিজ্ঞানের নীরস ও জটিল বিষয়ে কি সরস ও সরল আলোচনা সম্ভব? রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে মনে হবে অবশ্যই সম্ভব। তাঁর প্রবন্ধগুলি গভীর মননশীলতায় পূর্ণ কিন্তু কৌতুক ও প্রসাদময়তা থেকে বঞ্চিত নয়। তথ্যের প্রাচুর্যের মাঝেও সেগুলি উপস্থাপনের গুণে আড়ষ্ট হয়নি। দর্শনের উত্তরাধিকার তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে স্বীকার করেছিলেন এবং আধুনিক পৃথিবীকে সেই উত্তরাধিকারের মূল্য বোঝাতে সেখানেই নোঙর ফেলতে চেয়েছিলেন।[২] বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ হোক বা যুক্তি, তার অবতারণায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর সরস ও সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ রচনাশৈলীর কারণেই নীরস ও জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয় সর্বসাধারণের নিকট উপভোগ্য ও উপাদেয় হয়েছে। তিনি ছিলেন যথার্থ অর্থেই 'Pathbreaking Populariser of Science in Bengal'।

৫.৪. রামেন্দ্র-চিন্তনে সাংখ্যের উপাদান

রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। বহু বিষয়ে তাঁর দক্ষতার কারণে, একটি বিষয়ের আলোচনায় তিনি অনায়াসেই বিষয়ান্তরের উপস্থাপনা করতে পারতেন। এরই ফলস্বরূপ তাঁর লেখনী হতে জন্ম নিয়েছে 'প্রকৃতির মূর্তি', 'সৃষ্টি', 'জগতের অস্তিত্ব', 'পঞ্চভূত' ইত্যাদি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধগুলিতে ব্যাখ্যাত হয়েছে সাংখ্যদর্শনের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ।

৫.৪.১. প্রসঙ্গ: প্রকৃতি

সাংখ্যের মূল তত্ত্বদ্বয়ের মধ্যে 'প্রকৃতি'র সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী শুরুতেই পাঠকদের প্রতি 'বিধিসম্মত সতর্কীকরণ' দিয়েছেন, "সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির অর্থ লইয়া যথেষ্ট বাগ্‌বিতণ্ডা তুলিয়া একটি সুবৃহৎ ও সুপুষ্ট প্রবন্ধ লেখা চলিতে পারে। সেরূপ বিতণ্ডাক্ষেত্রে প্রবেশ না করিয়া, ব্যক্ত প্রকৃতি অর্থে মোটের উপর সকলে যাহা বুঝেন, তাহাই ধরিয়া লইব"।[৩] ব্যক্ত কথার অর্থ প্রকাশিত। অতএব যে ব্যক্তির নিকট জগৎ যেভাবে প্রতীয়মান হয় সেইটিই সেই ব্যক্তির নিকট ব্যক্ত প্রকৃতি। কিন্তু জগতের রূপটি কেমন? জগৎ রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দময়। তবে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে রূপ-রসাদি এইগুলি প্রত্যক্ষ জগতের অনুভবের বিষয়। অথচ প্রত্যক্ষ

জগতের বাইরেও অনুভবের বিষয় রয়েছে যা ব্যক্তির প্রতীয়মান হয় না। তাই বলে প্রত্যক্ষের অগোচর ঐ বাইরের অংশটিকে বাদ দেওয়া চলে না। প্রত্যক্ষজগৎ ও প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অবশিষ্ট জগৎ দুইটি মিলেই ব্যক্ত প্রকৃতি। যদি প্রকৃতির এই প্রসারিত ক্ষেত্রে কোনও একটি দিকে সীমানার বন্দোবস্ত করা হয় তাহলে অবশ্যই তা ব্যর্থ হবে কারণ "গোচর ও অগোচর উভয়ের মাঝে সীমারেখা অঙ্কিত করা সম্ভব না। গোচর অজ্ঞাতসারে অগোচরে লীন হইতেছে; অগোচর আসিয়া অজ্ঞাতসারে গোচরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে"।[৪]

সুস্থ ব্যক্তি ও বর্ণান্ধ ব্যক্তির মধ্যে বিচার করলে বোঝা যায় এক প্রকৃতি কীরূপে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে উভয়ের নিকট উপস্থিত হয়। সুস্থ ব্যক্তির চোখে রঙের গ্রহণের পদ্ধতিটি আশ্চর্যজনক। একটি ক্ষুদ্র চোখের ভেতরের কলকব্জা (mechanism) আরও আশ্চর্যজনক। খুব সোজাভাবে বললে চোখের পিছনের দেওয়ালে একধরনের কোষ থাকে (cone cells) যেগুলি লাল, সবুজ ও নীল এই তিনটি রঙের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল (responsive) হয় এবং ঐ তিনটি রঙ বিভিন্ন পরিমাণে মিশিয়ে নানারকম রঙ উৎপন্ন করে। অন্যদিকে বর্ণান্ধ ব্যক্তির চোখ সাধারণত লাল রঙের প্রতি প্রতিক্রীয়াশীল হয় না, ফলে তাদের কাছে বর্ণের বৈচিত্র্য তূলনামূলকভাবে কম। সুতরাং, ব্যক্ত প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্য একজন সুস্থ ব্যক্তি ও বর্ণান্ধ ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন।

তবে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গত অবস্থাকে দায়ী করলেই চলে না, ইন্দ্রিয়গত সীমাবদ্ধতাও প্রকৃতির ভিন্নমূর্তিতে উপলব্ধির জন্য অনেকাংশে দায়ী। প্রাবন্ধিক যুক্তি দিয়েছেন, আলোর তরঙ্গের সবকটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। যতটুকু দৃষ্টিগোচর হয়, ঐটুকুই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ক্ষমতা। প্রসঙ্গত, শব্দতরঙ্গের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শব্দতরঙ্গের যে পরিধি তার মধ্যে মানুষের শ্রুতিগোচর হয় ২০ হার্জ (hertz) থেকে ২০ হাজার হার্জ পর্যন্ত। তাই ২০ হার্জ এর নীচের শব্দতরঙ্গ (infrasound) এবং ২০ হাজার হার্জ এর উপরের শব্দতরঙ্গ (ultrasound) মানুষ শুনতে পায় না। কিন্তু অন্যান্য প্রাণী যেমন কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি ঐ মনুষ্য-শ্রুতি-অগোচর শব্দ শুনতে পায়। অতএব, ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা ব্যক্ত প্রকৃতির রূপকে সীমায়িত করে। তাই প্রকৃতির মূর্তির কোনও স্পষ্ট উত্তর হতে পারে না বলে প্রাবন্ধিকের অভিমত। তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বলেছেন, "আমার কাছে প্রকৃতির যেমন মূর্তি, তোমার কাছে ঠিক তেমন নহে। আবার কুকুর, বিড়াল, পাখী ইহাদের কাছে অন্যরকম; আবার কীটপতঙ্গের কাছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন"।[৫]

৫.৪.২. প্রসঙ্গ: সৃষ্টি

দর্শন হোক বা বিজ্ঞান বা সাহিত্য, সৃষ্টি সম্পর্কে এক একটি শাখার এক একরকম দৃষ্টিভঙ্গি। দর্শন তাত্ত্বিক প্রয়োগের (theoretical practice) মধ্যে দিয়ে ও বিজ্ঞান ব্যাবহারিক প্রয়োগের (practical practice) ধারায় সৃষ্টির ঊষালগ্নে পৌঁছানোর প্রয়াস করে চলেছে। এ যাত্রা বোধ হয় অন্তহীনের!

যন্ত্র আছে তাই যন্ত্রীও আছে- একথা লৌকিক জগতের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকার্য, কিন্তু চরাচর এই জগতের জন্যও একজন জগৎকর্তা থাকবে এর কোনও নিশ্চয়তা নেই। অর্থাৎ ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্বে আপত্তির জায়গা থেকেই যায়। প্রবন্ধকার সাংখ্যের সৎকার্যবাদের ধারণার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তন্তুবায় যে বস্ত্র তৈরি করেন, তা কোনও

নতুন বস্তু নয়। তন্তুর মধ্যেই ঐ বস্ত্র অবস্থিত ছিল; তন্তুবায় শুধুমাত্র বুদ্ধির জোগান দিয়ে ঐ বস্ত্রের আকার দান করেছেন। তাহলে সারকথা এই যে, জগৎ তৈরির উপাদান জগতের মধ্যেই অবস্থিত ছিল, সেখান থেকে জগতের উদ্ভব। তবে যে প্রশ্নের মীমাংসা বাকি থেকে গেল তা এই যে জগতের মধ্যেই অবস্থান করা ঐ উপাদানগুলি কোথা থেকে আসে? প্রবন্ধকার সরস আক্ষেপ ব্যক্ত করেছেন "ব্রহ্মাণ্ড গড়িবার মশলা কোথা হইতে আসিল, এ কথার উত্তর পাওয়া যায় না"।[৬]

সৃষ্টির পদ্ধতিতে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ রাখতে গিয়ে তিনি স্পষ্টরূপে জানিয়েছেন "বিজ্ঞানের মতে ঈথর এবং পরমাণু এই দুই মশলাতেই জগৎ নির্মিত"।[৭] বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এই যুক্তির পৃষ্ঠপোষক সংখ্যায় নগণ্য বললেই চলে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বেলজিয়ান ধর্মযাজক Georges Lemaître তাত্ত্বিকভাবে একটি মাত্র আদিম অণু থেকে "বিগ ব্যাংগ" এর মধ্যে দিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি স্বীকার করেন।[৮] পরবর্তীকালে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই ধারণা অনেকটা বদ্ধমূল হয়। Big Bang থিয়োরি ছাড়াও অপর কয়েকটি ধারণা এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীদের মধ্যে আলোচিত। যথা Quantum Universe Theory, Pre Big Bang Theory, Ekpyrotic Universe Theory ইত্যাদি।

হিসেব কষলে দেখা যাবে, যেকোনও মতবাদ লোকসমক্ষে প্রকাশিত হলে সেই মতবাদের আস্বাদনকালে ব্যক্তির মধ্যেকার দৃঢ়মূল-সংস্কার অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে তার উপস্থিতির জানান দেয়। স্বাভাবিকভাবেই, বদ্ধমূল সংস্কারের মূলোচ্ছেদ সহজ ব্যাপার নয়। সৃষ্টি সংক্রান্ত বিবিধ মতবাদগুলির ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। জগৎ এক অসীম ও প্রকাণ্ড পদার্থ, যার সামান্যতম অংশই মানুষের সসীম জ্ঞানপরিধিতে আধৃত হয়েছে। জ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে এই পরিধির বাইরের অংশের সাথে অল্পবিস্তর পরিচিতি ঘটে ঠিকই কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচয় অধরাই থেকে যায়। প্রবন্ধকার রুক্ষ ব্যঙ্গ করেছেন, "সম্প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের অতি সংকীর্ণ অংশে আমাদের জ্ঞান আবদ্ধ আছে; কিন্তু এই পরিধির বাহিরে আরও সর্বতোভাবে বিশালতর যে অংশ রহিয়াছে তাহার কিয়দংশের সহিত ক্রমশঃ আমাদের চেনা-শুনা ঘটিতে পারে, কিন্তু সমগ্রটা কখনই জ্ঞানের সীমানার ভিতর আসিবে না"।[৯]

৫.৪.৩. প্রসঙ্গ: জগতের অস্তিত্ব

সৃষ্ট জগৎ বা ব্যক্ত জগৎ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বিশেষ প্রশ্নের অবকাশ থাকে না কারণ দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহে তারা এতটাই নিবিষ্ট যে, চারপাশে বিদ্যমান জগৎ সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহের বিশেষ জায়গা নেই কিন্তু দার্শনিকেরা অত সোজা-সাপ্টা বুদ্ধি নিয়ে চলেন না। জগৎ তাদের কাছে অস্তিত্বের বা নাস্তিত্বের বিষয়।

জগতের অস্তিত্বে প্রবন্ধকারের কোনও সংশয় নেই। জাগতিক ঘটনাসমূহের নিরবচ্ছিন্নতা বোঝাতে তিনি 'জোনাকি পোকার আলো', 'মনুষ্য-হৃদয়ের স্পন্দন', 'রাজপথ পার্শ্বস্থ অট্টালিকা' 'বায়োস্কোপের ছবি' ইত্যাদি উপমার প্রয়োগ করেছেন। তাঁর মতে, জগতের অস্তিত্ব মূলত দুটি বিষয়ের অস্তিত্ব- একটি 'আমার অস্তিত্ব' এবং অন্যটি 'আমা-ছাড়ার

অস্তিত্ব'। তিনি স্পষ্টরূপে ইঙ্গিত করেছেন, জগৎ-বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে প্রাপ্ত এই দুটি অংশের মধ্যে 'আমি' অর্থে চৈতন্য। চৈতন্য'র অস্তিত্ব অস্বীকারের কোনও জায়গা নেই কারণ চৈতন্য স্বতঃসিদ্ধ।

একথাতে সর্বসম্মত হওয়া চলে যে, 'আমা-ছাড়া' অংশ (বাহ্য জগৎ) এবং 'আমি' এই উভয় সত্তাই চৈতন্যময়। আর, জগৎ যেহেতু 'আমি' ও 'আমা-ছাড়া বাকি সব' এই দুই অংশকে নিয়ে সম্পূর্ণ তাই এই দুই মিলে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় বইকি। দর্শনশাস্ত্রগুলি তাদের সুদীর্ঘ পরম্পরায় ও পর্যালোচনায় একটি 'সদ্বস্ত'র খোঁজে ব্যাপৃত। এই খোঁজে বস্তুজগৎকে তাঁরা সদ্বস্তু বলতে নারাজ। কিন্তু জড় জগতের যে একটা স্বরূপ আছে সেকথা অনেকে স্বীকার করলেও অনেকে স্বীকার করেন না। প্রবন্ধকার সাংখ্যের 'অব্যক্ত-প্রকৃতি' তত্ত্বকে সামনে রেখে বাহ্য জগতের বা জড় জগতের পটচিত্রটি উপস্থাপন করেছেন।

৫.৪.৪. প্রসঙ্গ: পঞ্চভূত

সৃষ্টিতত্ত্ব বা জগদ্ব্যাপারের সাথে সাথে জগতের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয়শূন্য হওয়ার পর প্রবন্ধকার জগতের উপাদানের বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন। সমগ্র জগতে যা কিছু বিষয়-বস্তু আছে, তার মৌলিক উপাদান কী কী- এই প্রশ্ন সেই সুদূর অতীত থেকে আজও বিদ্যমান। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রগুলির দিকে চোখ রাখলে দেখা যাবে, দার্শনিকেরা স্থূল জড় জগৎকে 'ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম' এই পাঁচটি মহাভূতে নির্মিত বলেই মনে করেন।

দার্শনিকের পঞ্চমহাভূতকে কোনওভাবেই জড় জগতের মূল উপাদানরূপে বোঝা উচিত নয়। তাই দর্শন শাস্ত্রে যে অর্থে 'মহাভূতের' প্রয়োগ, আধুনিক বিজ্ঞানের element কে সেই অর্থে সমন্বয় করাতে চাইলে প্রতি পদে বিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। দর্শনের দৃষ্টিকোণ ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা যেমন নেই, তেমনই বিরোধেরও প্রয়োজনীয়তা নেই বলেই প্রবন্ধকার মনে করেন। প্রবন্ধকার মনে করেন সাংখ্যের তথা দর্শনশাস্ত্রের এই মহাভূতগুলি আসলে এক একটি পারিভাষিক নাম তথা ধারণা (concept) মাত্র।

ভূতসকলকে এইরূপে concept বলার পিছনে প্রবন্ধকারের দৃঢ় যুক্তি রয়েছে। তাঁর মতে, আকাশকে শব্দগুণাত্মক বলা হয় দর্শনে। এবার যদি এমন একটি পদার্থ কল্পনা করতে বলা হয় যেটি শুধুমাত্র শব্দই তৈরি করে, যার মধ্যে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ নাই- জগতে তা সত্যিই দুর্লভ। তথাপি দর্শনে যখন শব্দতন্মাত্রকেই আকাশ বলা হয়, তখন বুঝতে হবে শব্দের সাথেই আকাশের সম্পর্ক। এখানে মন্তব্য করা যেতে পারে, আকাশ বলতে অনেকে space এই বিষয়টিকেও বোঝেন এবং শব্দের সাথে এই space এর সম্পর্ক সুপরিচিত। তবে, প্রাবন্ধিকের যুক্তি এখানেও সমান বলবৎ হয় কেননা, space ও একপ্রকার ধারণাই, কোনও স্থূল বা প্রত্যক্ষলব্ধ পদার্থ নয়। অতএব, স্থূল জড় জগৎ বা পাঞ্চভৌতিক জগৎ পঞ্চভূতে নির্মিত- এটি সম্পূর্ণরূপে দার্শনিক বিশ্লেষণ। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাথে এর বিরোধ বা সমন্বয় নেই, তবে পার্থক্য আছে।

৫.৫. উপসংহার

প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দর দর্শনের তর্ক-বিতর্কে নাকি বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নাকি সাহিত্যের প্রসাদ-মাধুর্যতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তা নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা হতে পারে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না, বিজ্ঞানকে তিনি উপরের খোলস থেকে দেখেননি; দেখেছেন নিজ বিশ্বাস-অবিশ্বাস তথা আনন্দ-নিরানন্দের সাথে মিলিয়ে। অন্যদিকে দর্শন তাঁর কাছে কেবল 'কথার মারপ্যাঁচ' নয়, তা বৈজ্ঞানিক সত্যবিচারের মঞ্চ (platform)। আর এই দুই পথে তিনি হেঁটে গেছেন সাহিত্যসুধা বর্ষণের মধ্যে দিয়ে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যথার্থ বলেছেন, "দর্শনই হউক বা বিজ্ঞানই হউক, ইতিহাসই হউক বা প্রত্নতত্ত্বই হউক- রামেন্দ্রবাবু যাহা লিখিতেন, তাহা যে শুধু প্রাঞ্জল হইত এমন নয়, সত্য সত্যই তাহার মধুরতায় প্রাণকে জল করিয়া দিত, পড়িতে কবিতার মত বোধ হইত, কল্পনায় মাখামাখি থাকিত, রসে ও ভাবে ভোর করিয়া দিত"।[১০]

উল্লেখপঞ্জি

[১] *রামেন্দ্র রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ২

[২] He had gladly accepted the Orientalist verdict of the uniqueness and excellence of the vedic-vedantic-sanskritic spiritual legacy and now sought his moorings therein, striving at the same time to adapt this legacy to the challenges of modern world. (Santanu Chacraverti, "Ramendrasundar Trivedi: A Pathbreaking populariser of Science in Bengal", *Uncharted Terrains*, p. 76)

[৩] *রামেন্দ্র রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪

[৪] *তদেব*, পৃ. ৪৬

[৫] *তদেব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০

[৬] *তদেব*, পৃ. ১৯২

[৭] *তদেব*, পৃ. ১৯৩

[৮] Belgian priest named Georges Lemaître first suggested the big bang theory in the 1920s, when he theorized that the universe began from a single primordial atom [Michael Greshko, *Origins of the universe, explained*, National Geographic, published Jan 18, 2017 (https://www.nationalgeographic.com/science/space/universe/origins-of-the-universe.html)]

[৯] *রামেন্দ্র রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৩

[১০] নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, *আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর*, পৃ. ২৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

ষড়্‌দর্শনের মধ্যে সাংখ্যের ন্যায় গভীর যুক্তিপূর্ণ মূলতত্ত্বসম্বন্ধীয় বিচার অন্য কোন দর্শনশাস্ত্রে নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাংখ্যের প্রকৃত মত বুঝেন বা বুঝাইতে পারেন, এমন পণ্ডিত বিরল।

- উমেশচন্দ্র বটব্যাল, *সাংখ্যদর্শন*

বাঙালির সাংখ্যচর্চার ইতিবৃত্ত

The Sāṁkhya holds a unique place in the history of Hindu thought, and is in many ways remarkable for the depth and subtlety of its criticism of human experience, besides possessing a peculiar terminology of its own

– Nandalal Sinha, Forward, *The Sāṁkhya-Pravachana-Sūtram*

৬.০. ভূমিকা

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যাবে প্রায় সবকটি প্রধান সারির দর্শনের একজন প্রবর্তক রয়েছেন। যেমন, সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তকরূপে মহর্ষি কপিল, যোগদর্শনের প্রবর্তকরূপে মহর্ষি পতঞ্জলি, ন্যায়দর্শনের প্রবর্তকরূপে মহর্ষি গৌতমের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ এইসব মহান চিন্তাবিদ্‌দের এক একজনের চিন্তা থেকেই এক একটি দর্শনের মূল চিত্রপটটি উপস্থাপিত হয়েছে। তবে মজার ব্যাপার এই যে, ঐসকল প্রবর্তকেরা তাদের প্রাথমিক খসড়াতে 'কপিরাইট' বসিয়ে যাননি। ফলত পরবর্তীকালে, অনুগামী, আলোচক, সমালোচক, পক্ষ, প্রতিপক্ষ সকলেই বিন্দু বিন্দু করে মতের আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে এই সুবিশাল দর্শন-সিন্ধু নির্মাণ করেছেন।

সাংখ্যদর্শনের ক্ষেত্রে একথাটি খুবই প্রযোজ্য। মহর্ষি কপিলকেই এই দর্শনের প্রবর্তক বলে মনে করা হয়। একথা সত্য যে, তাঁর চিন্তাসূত্রের প্রকৃত সূত্রিত রূপ অদ্যাবধি উপলব্ধ হয়নি। কিন্তু তাতে কী? ভারতীয় দর্শন কোনও ব্যক্তিদর্শন নয়; এ হল পরম্পরা বা সম্প্রদায় এর দর্শন। তাই সাংখ্যপ্রবর্তকের চিন্তার সূত্র পরবর্তীকালে সম্প্রদায়ের বিবিধ প্রাণপুরুষগণ যুক্তি-তর্কের মধ্যে দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন এবং কালের পরম্পরায় কারিকা, টীকা, টিপ্পনী, ভাষ্য, অনুবাদ, আলোচনা, সমালোচনা, প্রবন্ধ, উদ্ধৃতি ইত্যাদি বহু শাখা-প্রশাখা-পুষ্প-পল্লবে বিকশিত হয়ে উঠেছে সাংখ্যতরুটি।

৬.১. ধারণার ধারাভাষ্যে উত্তরণ

সুপ্রাচীন উপনিষদের সময় থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময় জুড়ে সাংখ্যের মূল ধারণাটির উত্তরণ ঘটেছে ধারাভাষ্যের মধ্যে দিয়ে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কারিকাকার, টীকাকার, ভাষ্যকার, প্রবন্ধকার, সমালোচক তাদের ভাষ্যস্রোতে সাংখ্যধারাকে প্রবহমান রেখেছেন। সাংখ্যদর্শনের ঐ প্রবাহে যে সমস্ত বাঙালি মনীষা তাদের মূল্যবান যোগদান রেখে গেছেন টীকা, টিপ্পনী, ভাষ্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনার মধ্যে দিয়ে; তাঁদের সাংখ্যচর্চার পরিধিটির উপর আলোকপাতের প্রয়াস হয়েছে এই অধ্যায়ে।

এই রচনাগুলিকে মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে- সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী, ও মৌলিক গ্রন্থ, বাংলা ভাষায় রচিত অনুবাদ, ব্যাখ্যা, প্রবন্ধ, ও সম্পাদিত গ্রন্থ এবং ইংরাজি ভাষায় রচিত অনুবাদ, প্রবন্ধ ও আলোচনামূলক গ্রন্থ

৬.১.১. সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী ও মৌলিক গ্রন্থ

প্রথমেই আসা যাক সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির সম্পর্কে। বেশির ভাগ গ্রন্থই টীকা-টিপ্পনী মূলক। ঈশ্বরকৃষ্ণের *সাংখ্যকারিকা*, ও বাচস্পতি মিশ্রের *তত্ত্বকৌমুদী*র উপরই অধিকাংশ টীকা রচিত। এর যথাযথ কারণ বলা না গেলেও, অনুমান করা চলে, ঈশ্বরকৃষ্ণের *সাংখ্যকারিকা* ও তার উপর রচিত বাচস্পতি মিশ্রের *তত্ত্বকৌমুদী* টীকাকেই বঙ্গদেশের

বেশির ভাগ টীকাকার প্রামাণ্য বলে মনে করতেন। তবে সাংখ্যসূত্র ও সাংখ্যসূত্রবৃত্তির উপরও বেশ কিছু টীকা-টিপ্পনী রচিত হয়েছিল।

রঘুনাথ তর্কবাগীশ

সাংখ্যকারিকার উপর রঘুনাথ তর্কবাগীশ রচনা করেন *সাংখ্যতত্ত্ববিলাস* বা *সাংখ্যবৃত্তিপ্রকাশ* নামের টীকাটি। *সাংখ্যার্থসংখ্যায়িকা* নামেও এই টীকাটি পরিচিত। এই টীকার প্রারম্ভে তিনি *তত্ত্বসমাসসূত্র* সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন ও তারপর *সাংখ্যকারিকার* ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছেন। সম্ভবত, সাংখ্য পরম্পরাটিকে তিনি নির্দেশ করতে চেয়েছেন।[১]

তারানাথ তর্কবাচস্পতি

বাচস্পতি মিশ্রের *তত্ত্বকৌমুদীর* উপর তারানাথ তর্কবাচস্পতি রচনা করেন *উপোদ্‌ঘাত* নামের টিপ্পনী। New Catalogus Catalogorum এ এই টিপ্পনীর উল্লেখ রয়েছে *বৃত্ত্যুপোদ্‌ঘাত* নামে। নাম থেকেই বোঝা যায় এটি 'উপোদ্‌ঘাত' স্বরূপ, সম্পূর্ণ টীকা নয়। তর্কবাচস্পতি মহাশয় সম্ভবত তার পাঠার্থীদের প্রয়োজনেই এই উপোদ্‌ঘাতের (introductory notes) রচনা করেছিলেন। অসৎকার্যবাদ, বিবর্তনবাদ, বুদ্ধিন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, পুরুষ সম্পর্কে আলোচনা আছে এই অংশে।[২]

প্রমথনাথ তর্কভূষণ

অনিরুদ্ধের *সাংখ্যসূত্রবৃত্তির* উপর প্রমথনাথ তর্কভূষণ রচনা করেন *অমলা* নামের ভাষ্যটি। মূলত পাঠার্থীদের প্রাথমিক জ্ঞানের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে এই ভাষ্য বিন্যস্ত হয়েছিল। যেকারণেই, নব্য-ন্যায়ের শৈলী থেকে এই ভাষ্য ছিল মুক্ত।[৩]

কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন

বাচস্পতি মিশ্রের *তত্ত্বকৌমুদীর* উপর কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন রচনা করেন *আবরণবারিণী* নামের টিপ্পনী। *তত্ত্বকৌমুদীর* উপর রচিত এই টিপ্পনীতে অতিরিক্ত কথা নেই, তবে শৈলীটি ন্যায়ের। সাংখ্যের পাঠার্থীদের প্রাথমিক জ্ঞানের প্রয়োজন মেটাতে সরল সংস্কৃতে লেখা এটি একটি উপাদেয় টিপ্পনী।[৪] বিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে এই টিপ্পনীর রচনাকাল।

স্বামী হরিহরানন্দ অরণ্য

সাংখ্য মত অবলম্বনে স্বামী হরিহরানন্দ অরণ্য রচনা করেন মৌলিক গ্রন্থ *সাংখ্যতত্ত্বালোক*। সাংখ্য যোগ পরম্পরায় ৭২টি পরিচ্ছেদে রচিত হয়েছে এই মৌলিক গ্রন্থটি। গ্রন্থের প্রারম্ভেই অসাধারণ একটি উপমার সাহায্যে তিনি কালের করালগ্রাস প্রাপ্ত সাংখ্যশাস্ত্র ও তার প্রণেতা মহর্ষি কপিলকে বন্দনা করেছেন- যথা কলাবশিষ্টোঽপি শশী রাজত্যুপপ্লুতঃ/ তারকাদখিলাৎ সম্যক্ প্রোজ্জ্বলশ্চ তমোপহঃ/ কালরাহুসমাক্রান্তমপি তদ্বদ্‌বিভাতি যৎ/ সর্বতীর্থেষু শাস্ত্রস্য বক্তারং

কপিলং নুমঃ/ অর্থাৎ অন্ধকার নাশক চন্দ্র যেমন রাহুর গ্রাসে গ্রসিত হয়েও আকাশের সমস্ত তারার চেয়ে উজ্জ্বলরূপে প্রতীত হয়, তেমনই কাল রূপ রাহুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েও যে শাস্ত্র অন্য সকল শাস্ত্রাপেক্ষা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, সেই সাংখ্যশাস্ত্র ও তার বক্তা মহর্ষি কপিলকে নমস্কার।[৫]

এছাড়াও নরেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি, পঞ্চানন তর্করত্ন, কুঞ্জবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত, রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ,প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

৬.১.২. বাংলা ভাষায় রচিত অনুবাদ, ব্যাখ্যা, প্রবন্ধ ও সম্পাদিত গ্রন্থ

এবারে আসা যাক বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির সম্পর্কে। বেশির ভাগ গ্রন্থই অনুবাদ ও ব্যাখ্যামূলক। তাছাড়া, সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যাও অনেককটি। আবার, বেশ কিছু প্রবন্ধ সংকলনে কোনও একটি প্রবন্ধেও সাংখ্যের আলোচনা উপলব্ধ হয়। বস্তুত, যে সমস্ত বাঙালি বাংলা ভাষায় ভারতীয় দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা সাংখ্যদর্শনের আলোচনার গুরুত্ব যথার্থ অর্থেই উপলব্ধি করেছিলেন।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ধর্ম ও দর্শনতত্ত্ব সমন্বিত দশটি সংবাদ দিয়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন প্রবন্ধ গ্রন্থ *ষড়্দর্শন সংবাদ*। উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যে দিয়ে দর্শনসমূহের ব্যাখ্যায় তিনি প্রবৃত্ত হয়েছেন। জটিল তত্ত্বদর্শনকে তিনি অতি সহজ ও সুকৌশলে উপন্যাস করার দক্ষতা রাখতেন। সত্যকাম ও কাপিল এইরূপ দুটি কল্পিত চরিত্রের অবতারণা করে তাদের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে সাংখ্যদর্শনের বিবিধ দিক ব্যাখ্যাত হয়েছে।[৬]

উমেশচন্দ্র বটব্যাল

সাংখ্যের বিবিধ তত্ত্বের উপর বহুবিধ প্রবন্ধের একত্র সংকলন গ্রন্থ উমেশচন্দ্র বটব্যাল এর *সাংখ্য দর্শন*। সাংখ্যের বিবিধ বিষয় যেমন মহৎ, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, প্রকৃতি, পুরুষ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এই গ্রন্থে। প্রাঞ্জল ভাষার গুণে অতি জটিল বিষয়কেও তিনি সহজ ও সুখবোধ্য রূপে উপস্থাপন করেছেন।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সাংখ্যের বহুবিধ বিষয়ে প্রদত্ত বক্তৃতার উপর ভিত্তি করে এক প্রবন্ধধারার সংকলন গ্রন্থ হীরেন্দ্রনাথ দত্তের *সাংখ্য পরিচয়*। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আহ্বানে পরিষদ্-মন্দিরে তিনি সাংখ্যের উপর কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতার বিষয়গুলিই পুনরায় প্রবন্ধাকারে সজ্জিত করে প্রকাশিত হয় সাংখ্য পরিচয়।

অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি

সর্বসাধারণের বোধের সুবিধার জন্য গুরু ও শিষ্যের প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে সাংখ্যের তত্ত্বগুলি অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি প্রণীত *সাংখ্য রহস্য* গ্রন্থে। দর্শনসমূহের আর্ষ তাৎপর্য উপলব্ধিতে যাতে কেউ বঞ্চিত না হন, তাই প্রশ্নোত্তরচ্ছলে গ্রন্থকারের এই প্রয়াস।

এছাড়াও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, কালীবর বেদান্তবাগীশ, সুরেন্দ্রনাথ রায়, মহেশ চন্দ্র পাল, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু, ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

৬.১.৩. ইংরাজি ভাষায় রচিত অনুবাদ, প্রবন্ধ ও আলোচনামূলক গ্রন্থ

এখন দেখা যাক ইংরাজি ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির সম্পর্কে। এক্ষেত্রেও বেশির ভাগ গ্রন্থই অনুবাদ ও ব্যাখ্যামূলক। বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলি অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলেও সর্বভারতীয় স্তরে সেগুলির পরিচিতির সীমাবদ্ধতা থেকেই যায়। তূলনামূলকভাবে, ইংরাজি ভাষায় রচিত গ্রন্থের ব্যাপ্তি অনেকটাই বেশি।

পুলিনবিহারী চক্রবর্তী

সাংখ্য পরম্পরা ও চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ নিয়ে সুদীর্ঘ ও তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেন পুলিনবিহারী চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর *Origin and Development of the Sāṁkhya System of Thought* গ্রন্থে। সাংখ্য পরম্পরাটির কীভাবে ক্রমবিকাশ হয়েছে সেইটি দেখানোর চেষ্টা করেছেন গ্রন্থকার।

জে.এন.মুখার্জি

সাংখ্যকারিকার উপর একটি ভিন্ন আঙ্গিকের ব্যাখ্যা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন জে.এন.মুখার্জি তাঁর *Sāṁkhya or The Theory of Reality* গ্রন্থে। *সাংখ্যকারিকাকে* তিনি ব্যাখ্যা করেছেন দুটি দিক থেকে। 'দুঃখ' শব্দটিকে বাদ দিলে প্রথম ৫২টি কারিকা যথার্থ সাংখ্য এবং পরবর্তী ১৬টি কারিকা মিথ্যা সাংখ্য – "The two Sāṁkhyas in Sāṁkhya-Kārikā may be separated from each other. The first fifty-two kārikās without the term Duḥkha contain the genuine Sāṁkhya, while the sixteen kārikās from 53 to 68 propound the false Sāṁkhya".[৭]

যজ্ঞেশ্বর ঘোষ

সাংখ্যের তত্ত্ব ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি যজ্ঞেশ্বর ঘোষ আলোচনা করেছেন তাঁর *Sāṁkhya and Modern Thought* গ্রন্থে। কারিকা বা সূত্রকে সরাসরি অনুসরণ করেননি গ্রন্থকার বরং তত্ত্বগুলির পর্যালোচনা করেছেন নিজস্ব ব্যাখ্যাশৈলীতে। গ্রন্থের অধ্যায়গুলিতে লক্ষ্য করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা, 'The Scope of the Sāṁkhya', 'Bondage and the Soul', 'The mind and the Soul' প্রভৃতি। গ্রন্থকার দেখানোর চেষ্টা করেছেন সাংখ্য ও বেদান্ত এই দুই দর্শনই 'ভোগ'কে সর্বাধিক মূল্য দেওয়া হতে বিরত থেকেছে এবং সমস্ত প্রকার অনর্থের সোনালি সূচক রূপে 'ভোগ'কে নির্দেশ করেছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের আঙ্গিক থেকে সাংখ্যের প্রকৃতি তত্ত্বের ব্যাখ্যার প্রয়াস করেছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁর *The Positive Sciences of the Ancient Hindus* গ্রন্থে। তাৎপর্যপূর্ণ এই যে, আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ

থেকেও তিনি প্রকৃতি তত্ত্বের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। স্বীকার-অস্বীকারের প্রশ্ন থেকে সরে আসলে এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনব।

অণিমা সেনগুপ্ত

সাংখ্যের তত্ত্ব ও তথ্য নিয়ে প্রমাণ-প্রমেয় ভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করেছেন অণিমা সেনগুপ্ত তাঁর *Classical Sāṁkhya: A Critical Study* গ্রন্থে। মুক্তির বিষয়ে পাশ্চাত্যের ধারণার কথা উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন সামান্য পরিবেশগত বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে ঐগুলি সম্ভব; কিন্তু মনুষ্য সত্তার চরম প্রাপ্তিরূপ যে মুক্তির অবস্থা, তার প্রাপ্তিতে প্রয়োজন মনুষ্য সত্তা ও এই জগতের মৌলিক নীতিগুলির সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা।

এছাড়াও অভয় কুমার মজুমদার, নন্দলাল সিনহা, সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী, গোপীনাথ কবিরাজ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

৬.২. উপসংহার

সাংখ্যচর্চায় যেসব বাঙালি নিজেদের নিয়োজিত করেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তান্ত এর মধ্যে আলোচিত হয়েছে। তবে আধুনিক বাঙালির দর্শনচর্চার একটু গোড়ার কথা যদি বলতে হয়, তাহলে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে ঊনিশ শতককে বিশেষভাবে মনে করতে হয়। ইংরেজ শাসনকালে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বাঙালির চিন্তাজগতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল, তারই প্রভাব লক্ষ্য করা যায় দার্শনিক চর্চার মধ্যে। আগামী দিনে এই দর্শন চিন্তার প্রবাহ কোন দিকে- তার উত্তর অবশ্য আগামীর জন্য তোলা থাক; তবে যুক্তিশীল বাঙালির দর্শন চিন্তা ও চর্চা অত্যন্ত ক্ষীণস্রোতা হয়েও যে প্রবহমান থাকবে, সেকথা প্রায় নিশ্চয়তার সাথে বলা চলে।

উল্লেখপঞ্জি

[১] Larson & Bhattacharya, *Encyclopedia of Indian Philosophies*, Vol.IV, p. 459

[২] *Ibid.*, Vol.IV, p. 463

[৩] *Ibid.*, Vol.IV, p. 473

[৪] *Ibid.*, Vol.IV, p. 487

[৫] হরিহরানন্দ আরণ্য, *কপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শন, সাংখ্যতত্ত্বালোকঃ*, পৃ. ৩১১

[৬] অধীর দে, *আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা*, পৃ. ৬৫

[৭] J N Mukerji, *Sāṁkhya or The Theory of Reality*, Preface, p. vi

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

দার্শনিক চিন্তাভাবনার গোড়াপত্তনের কথা বললে অবশ্যই উপনিষদের প্রসঙ্গই প্রথম আপতিত হয়, তবে যুক্তিনির্ভর আলোচনার দিক থেকে সাংখ্যই একপ্রকার প্রথম পদক্ষেপ। পরবর্তীতে তার অবদান সুদূরপ্রসারী। ষোড়শ শতাব্দীর সাংখ্যাচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু এই মোক্ষশাস্ত্র সাংখ্যকে চিকিৎসাশাস্ত্রের সাথে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে চিকিৎসাশাস্ত্রে যেমন রোগ-আরোগ্য-রোগনিদান-ভৈষজ্য এই চতুর্ব্যূহের আলোচনা তেমনই সাংখ্যশাস্ত্রে হেয়-হান-হেয়হেতু-হানোপায় এই চারটির প্রতিপাদন হয়েছে। ত্রিবিধ দুঃখই সেখানে হেয়, দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হান, প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগজাত অবিবেকই হেয়হেতু এবং প্রকৃতি-পুরুষ বিবেকখ্যাতি বা ভেদজ্ঞানই হানোপায়।[১]

অতএব মোক্ষশাস্ত্ররূপ সাংখ্যের আলোচনায় অংশ নিয়েছেন আলোচকরা। সমগ্র ভারতভূমি জুড়ে আলোচনা-পর্যালোচনার যে ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল, তাতে অংশীদার ছিলেন বাঙালি মনীষাও। এমনই একজন হলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। পরিপূর্ণরূপে গৃহী হওয়ায় প্রবৃত্তির একেবারে ধ্বংস তিনি চাননি বরং এমন তাৎপর্য খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছেন যা জীবনের গতিপথকে ঊর্ধ্বায়িত করে। তত্ত্ব (theory) ও প্রয়োগ (application) এই দুই ধারার মধ্যে তিনি দৃঢ়ভাবে দ্বিতীয় মার্গের কথা বলেছেন। "ভারতবর্ষে দেখতে পাই মনীষার এমন একটি ধারা যাতে শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে কিন্তু সে ধারা রুদ্ধগতি ও ক্ষয়িষ্ণু। এখনো টোলে দর্শন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে কিন্তু সে শিক্ষা অনুর্বর নিষ্ফল। হিন্দু দর্শনকে দুভাবে পড়া যেতে পারে- শুধুই তত্ত্বের জন্য অথবা ভারতীয় ইতিহাসের গতিকে বোঝার জন্য। যে চিন্তা জাতীয় সমাজের পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করছে, সেটাই জানা এখন আমাদের দরকার হয়ে পড়েছে। নিছক তত্ত্বের জন্য হিন্দু দর্শন পড়ার দরকার আছে বলে মনে হয় না"।[২] সুপ্রাচীন অতীত আদর্শের কার্যকারিতা, বর্তমান গতিময় সময়ে অক্ষুণ্ণ থাকতে নাও পারে? তাই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি খুব স্পষ্ট- "Let us revere the past, but we must, in justice to our new life, adopt new life, adopt new methods of interpretation and adopt the old eternal and underlying truths to the necessities of that new life".[৩] একথা বোধগম্য হয় যে, ভারতীয় সমাজের তাৎকালীক গতিকে উপলব্ধির অভিপ্রায়েই সম্ভবত তিনি সাংখ্যের ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করেছিলেন। যথেষ্ট আধুনিক ও স্পষ্টদৃষ্টিতে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর 'লক্ষ্য পাঠক' (target reader) পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং "এই শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলেও তাহা বুঝিতে পারেন না"।[৪] পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বশবর্তী হওয়ায় প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা-প্রণালী ঐ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অপরিচিত। তাই "তাঁহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, পাশ্চাত্য ভাবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়"।[৫]

অন্যদিকে পরিপূর্ণরূপে একজন গৃহীর বিপরীত প্রান্তে স্বামীজি ছিলেন পূর্ণতা ও পবিত্রতার উপাসক। আলোচনা দর্শনের হোক বা বিজ্ঞানের বা সাহিত্যের, তিনি গেয়ে গেছেন পূর্ণতা ও পবিত্রতারই জয়গান। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ব্যক্তিত্বের এই পূর্ণতা ও পবিত্রতা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর শৈলীতে। সেকারণেই মানব-অভ্যুদয়ের পথে *struggle for existence* অথবা *survival of the fittest* এই জাতীয় তত্ত্ব তিনি মেনে নিতে চাননি বরং পূর্ণতাকে 'পাখির চোখ' করে জীবের পূর্ণতার অনুসন্ধান করে গেছেন- "আমার বিবেচনায় struggle (লড়াই) এবং competition

(প্রতিদ্বন্দ্বিতা) জীবের পূর্ণতালাভের পক্ষে অনেকসময় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। হাজার জীবনকে ধ্বংস করে যদি একটা জীবের ক্রমোন্নতি হয়, - যা পাশ্চাত্ত্যদর্শন সমর্থন করে, তা হলে বলতে হয় এই evolution (ক্রমবিকাশ) দ্বারা সংসারের বিশেষ কোনো উন্নতিই হচ্ছে না। সাংসারিক উন্নতির কথা স্বীকার করে নিলেও আধ্যাত্মিক বিকাশকল্পে ওটা যে বিষম প্রতিবন্ধক, একথা স্বীকার করতেই হয়। আমাদের দেশীয় দার্শনিকগণের অভিপ্রায় জীবমাত্রই পূর্ণ আত্মা" {In my opinion, struggle and competition sometimes stand in the way of a being's attaining its perfection. If the evolution of an animal is effected by the destruction of a thousand others, then one must confess that this evolution is doing very little good to the world}।[৬]

স্বামীজি এই পূর্ণতা ও পবিত্রতাকেই সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পবিত্র ভারতীয় দর্শনের পত্র-পল্লব-পুষ্পের সমূহ থেকে পূর্ণ 'বেদান্ত-পারিজাত'কে চয়ন করেছিলেন। কিন্তু একথা তিনি কখনই বিস্মৃত হননি যে, বেদান্তের ক্ষুদ্র চারাগাছ যে উর্বর মৃত্তিকায় প্রোথিত, সেই মৃত্তিকা সাংখ্যের হাতেই প্রস্তুত হয়েছিল। সেইকারণেই, বেদান্ত আলোচনার প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি সাংখ্যপ্রণেতা মহর্ষি কপিলকে স্মরণ করেছেন। আর এরূপ স্মরণকালে আবারও তাঁর ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা ও পবিত্রতা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর বক্তব্যে- "আমাদের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কপিল বলিয়াছেন, যদি পবিত্রতা আত্মার স্বরূপ না হয় তবে আত্মা কখনই পরে পবিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে না কারণ যাহা স্বভাবতঃই পূর্ণ নহে তাহা কোনোরূপ পূর্ণতা লাভ করিলেও ঐ পূর্ণতা আবার চলিয়া যাইবে। ...এজন্য আমাদের সকল দার্শনিক বলেন পবিত্রতাই আমাদের স্বভাব, অপবিত্রতা নয়। পূর্ণত্বই আমাদের স্বভাব, অপূর্ণতা নয়"।[৭]

গৃহী হোক বা গৃহীর বিপরীত, সামগ্রিক আলোচনার সন্ধান কিন্তু পূর্ণতার প্রতিই। এরূপই একজন পূর্ণতার সাধক প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। দর্শনের তর্ক-বিতর্কে নাকি বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নাকি সাহিত্যের প্রসাদ-মাধুর্যতায় তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তা নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা হতে পারে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না, বিজ্ঞানকে তিনি উপরের খোলস থেকে দেখেননি; দেখেছেন নিজ বিশ্বাস-অবিশ্বাস তথা আনন্দ-নিরানন্দের সাথে মিলিয়ে। অন্যদিকে দর্শন তাঁর কাছে কেবল 'কথার মারপ্যাঁচ' নয়, তা বৈজ্ঞানিক সত্যবিচারের মঞ্চ (platform)। আর এই দুই পথে তিনি হেঁটে গেছেন সাহিত্যসুধা বর্ষণের মধ্যে দিয়ে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যথার্থ বলেছেন, "দর্শনই হউক বা বিজ্ঞানই হউক, ইতিহাসই হউক বা প্রত্নতত্ত্বই হউক- রামেন্দ্রবাবু যাহা লিখিতেন, তাহা যে শুধু প্রাঞ্জল হইত এমন নয়, সত্য সত্যই তাহার মধুরতায় প্রাণকে জল করিয়া দিত, পড়িতে কবিতার মত বোধ হইত, কল্পনায় মাখামাখি থাকিত, রসে ও ভাবে ভোর করিয়া দিত"।[৮] চর্চায় অভিনবত্ব ও সূক্ষ্মতা থাকলে যেকোনও মাপের চর্চা যেকোনও ভাষায় সম্ভব- এর দৃষ্টান্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়। বিশেষত আজকের মাতৃভাষা অবহেলার যুগে, আজীবন বাংলা ভাষার চর্চায় অসামান্য প্রবন্ধরাশির প্রস্তুতকারক, মাতৃভাষার এমন বিরল একনিষ্ঠ সাধক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে 'শতকোটি প্রণাম'।

আধুনিক বাঙালির দর্শনচর্চার একটু গোড়ার কথা যদি বলতে হয়, তাহলে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে ঊনিশ শতককে বিশেষভাবে মনে করতে হয়। ইংরেজ শাসনকালে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাব বাঙালির চিন্তাজগতে যে বৈপ্লবিক

পরিবর্তন এনেছিল, তারই প্রভাব লক্ষ্য করা যায় দার্শনিক চর্চার মধ্যে। বাঙালির দর্শন চিন্তার ও চর্চার প্রসঙ্গে অধ্যাপক রামদুলাল রায় তাঁর "বাঙালির দর্শন: প্রাচীন কাল থেকে সাম্প্রতিক কাল" গ্রন্থে জনৈক সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করেছেন, "বাঙালির ধর্মকর্মে ঐতিহ্য আছে, বর্ণাঢ্য কাব্যসাহিত্য ও শিল্পকলা আছে; কিন্তু উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কোন দর্শন নেই। বাঙালি সংকর জাতি। জলবায়ুগত কারণে বাঙালি মাত্রেই আবেগপ্রবণ, জীবনবিরাগী, কর্মবিমুখ ও পরলোকমুখী। তাছাড়া দর্শনচর্চার জন্য যে দৃঢ় মানসিকতা ও যুক্তিনিষ্ঠতা থাকা দরকার বাঙালির তা নেই। বাঙালির দর্শন চিন্তায় শুদ্ধ চর্চার ঐতিহ্য বিশেষ পরিপুষ্ট নয়"।[৯] এই অভিযোগ সর্বৈব সত্য নয়। প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় বাংলার দিকে দৃষ্টিপাত করলে যেমন ভারতীয় দর্শন বিশেষত আস্তিক দর্শনের উপর অনেক সুচিন্তিত ব্যাখ্যা ও আলোচনা দেখতে পাওয়া যায় তেমনই নবজাগরণের পর প্রাচ্য দর্শনের সাথে সাথে পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও আধুনিক বাঙ্গালীর দর্শন চিন্তা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। আগামী দিনে এই দর্শন চিন্তার প্রবাহ কোন দিকে- তার উত্তর অবশ্য আগামীর জন্য তোলা থাক; তবে যুক্তিশীল বাঙালির দর্শন চিন্তা ও চর্চা অত্যন্ত ক্ষীণস্রোতা হয়েও যে প্রবহমান থাকবে, এরকম আশা করা চলে। তাই সাংখ্যকে ভারতীয় দর্শনের কেবল একটি শাখা মাত্র রূপে বিচার করলে সঠিক বিচার হয় না, বরং একথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হয় না যে সাংখ্যই ভারতের দর্শন। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের ভাষায়- *Sāṁkhya is not one of the systems of Indian Philosophy. Sāṁkhya is the philosophy of India!*[১০]

উল্লেখপঞ্জি

[১] তদিদং মোক্ষশাস্ত্রং চিকিৎসাশাস্ত্রবচ্চতুর্ব্যূহম্। যথা হি রোগ আরোগ্যং ভৈষজ্যমিতি চত্বারো ব্যূহাঃ সমূহাশ্চিকিৎসাশাস্ত্রস্য প্রতিপাদ্যাস্তথৈব হেয়ং হানং হেয়হেতুঃ হানোপায়শ্চেতি চত্বারো ব্যূহা মোক্ষশাস্ত্রস্য প্রতিপাদ্যা ভবন্তি মুমুক্ষুর্ভিজিজ্ঞাসিতিত্বাত্। তত্র ত্রিবিধং দুঃখং হেয়ম্ তদত্যন্তনিবৃত্তির্হানম্ প্রকৃতিপুরুষসংযোগদ্বারা চাবিবেকো হেয়হেতুঃ বিবেকখ্যাতিস্তু হানোপায় ইতি। [রামশংকর ভট্টাচার্য (সম্পা.) *সাংখ্য দর্শন* (বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ভাষ্য-সমেতম্), পৃ. ৮]

[২] ভবতোষ দত্ত, *চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র*, পৃ. ১৫

[৩] অরবিন্দ পোদ্দার, *বঙ্কিম-মানস*, পৃ. ৯০

[৪] *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৮০

[৫] তত্রৈব

[৬] *বাণী ও রচনা*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৭৫

[৭] *তদেব*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১৫

[৮] নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, *আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর*, পৃ. ২৭

[৯] রামদুলাল রায়, *বাঙালির দর্শন: প্রাচীন কাল থেকে সাম্প্রতিক কাল*, পৃ. ৪১

[১০] *Encyclopedia of Indian Philosophies*, Vol. IV, Ed. Larson & Bhattacharya, Preface, p. xi

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা গ্রন্থসমূহ

আচার্য্য, দেবেশ কুমার। *প্রবন্ধ বিচিত্রা*। কলকাতা: প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১৭ (১০ম সং)। মুদ্রিত।

ঈশ্বরকৃষ্ণ। *সাংখ্যকারিকা*। সম্পা. পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৭ (২য় মুদ্রণ) (১ম সংস্করণ, ১৯০১)। মুদ্রিত।

কালীবর বেদান্তবাগীশ (অনূদিত), *সাংখ্য-দর্শনম্*। দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (সম্পা.)। কলিকাতা (এখন কলকাতা): সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ (ষষ্ঠ সংস্করণ)। পিডিএফ।

ঘোষ, অপূর্ব্বকৃষ্ণ। *আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ১৯২৩। মুদ্রিত।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। *বিবিধ প্রবন্ধ*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): হেয়ার প্রেস, ১৮৯৬ (২য় সং)। পিডিএফ।

দত্ত, ভবতোষ। *চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮। মুদ্রিত।

দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ। *সাংখ্য পরিচয়*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): কনকেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ। পিডিএফ।

দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ। *ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): মিত্র ও ঘোষ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ। পিডিএফ।

দে, অধীর। *আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা*। কলকাতা: সৃষ্টি প্রকাশনী, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ। পিডিএফ।

পণ্ডিত, নলিনীরঞ্জন। *আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর* (প্রবন্ধ সংকলন)। কলিকাতা (এখন কলকাতা): বেঙ্গল বুক কোম্পানী, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ। মুদ্রিত।

পাল, মহেশচন্দ্র (সম্পা.)। *সাংখ্যদর্শনম্*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): মহেশচন্দ্র পাল, ১৮০৭ শকাব্দ। পিডিএফ।

পোদ্দার, অরবিন্দ। *বঙ্কিম-মানস*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৩ (নবম মুদ্রণ) (১ম সং, ১৯৫১)। মুদ্রিত।

বটব্যাল, উমেশচন্দ্র। *সাংখ্য-দর্শন*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): নরেন্দ্রনাথ বটব্যাল, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ। পিডিএফ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী। *আলিবাবার গুপ্তভাণ্ডার* (প্রবন্ধ সংকলন)। কলকাতা: গাঙচিল, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ। মুদ্রিত।

বাচস্পতি মিশ্র। *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*। সম্পা. নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৬ (পুনর্মুদ্রণ) (৫ম প্রকাশ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ)। মুদ্রিত।

বাজপেয়ী, আশুতোষ। *রামেন্দ্রসুন্দর*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ। মুদ্রিত।

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন। *বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫ (পঞ্চম মুদ্রণ)। মুদ্রিত।

ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব। *পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রা. লি., ১৯৬৬। মুদ্রিত।

ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্র নাথ। *সাংখ্যদর্শন*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): সংস্কৃত কলেজ, ১৯৮৫ (পুনর্মুদ্রণ) (১ম সংস্করণ, ১৯৬৬)। মুদ্রিত। কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা-৪৬।

ভট্টাচার্য্য, বিধুভূষণ। *সাংখ্যদর্শনের বিবরণ*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৮ (২য় মুদ্রণ) (১ম প্রকাশ, ১৯৮৪)। মুদ্রিত।

ভারতীয় দর্শন কোষ। দ্বিতীয় খণ্ড। সম্পা. শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ও দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। কলিকাতা (এখন কলকাতা): সংস্কৃত কলেজ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ। মুদ্রিত। কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা-১১৮।

মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ। *বিবেকানন্দ চরিত*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪১১ বঙ্গাব্দ (ষোড়শ মুদ্রণ)। মুদ্রিত।

মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (সম্পা.)। *সাঙ্খ্যদর্শন*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ?। পিডিএফ।

রায়, সুরেন্দ্রনাথ। *সাংখ্য-দর্শন*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ। পিডিএফ।

শর্ম্মা, অন্নদাচরণ। *সাংখ্য রহস্য*। কাশী: যতীন্দ্রকুমার কাব্য ব্যাকরণতীর্থ, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ। পিডিএফ।

সেন, সুকুমার। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ (ষষ্ঠ মুদ্রণ)। মুদ্রিত।

English/Sanskrit Books

Banerji, Suresh Chandra. *Sankhya Philosophy*. Calcutta (now Kolkata): Hare Press, ?. PDF.

Chakravarti, Chintaharan. "Bengal's Contribution To Sanskrit Literature (A Chronological Frame-Work)." *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*, vol. 11, no. 3, 1930, pp. 235–258. *JSTOR*, www.jstor.org/stable/41688185. Accessed 7 Dec. 2020.

Chakravarti, Pulinbihari. *Origin and Development of the Sāṁkhya System of Thought*. Calcutta (now Kolkata): Metropolitan Printing and Publishing House Ltd., 1951. Print.

Dasgupta, S N. *A History of Indian Philosophy*. Vol-I. New Delhi: Motilal Banarasidas, 2015 (8th rpt.) (1st Cambridge edition 1922). Print.

Ghosh, Jajneswar. *Sāṁkhya and Modern Thought*. Calcutta (now Kolkata): The Book Company Ltd., 1930. Print.

Gopinath Kaviraj, *Selected Writings of Mahamahopadhyaya Gopinath Kaviraj*. Varanasi: Indica Books, 2006 (1st ed. 1990). Print.

Majumdar, Abhay Kumar. *The Sāṅkhya Conception of Personality*. Calcutta (now Kolkata): Calcutta University Press, 1930. Print.

Majumdar, RC. *Swami Vivekananda: A historical review*. Kolkata: Advaita Ashrama, 2013(3rd rpt.) (1st ed. 1965). Print

Maxmuller, Fredrich. *The Six Systems of Indian Philosophy*. New York: Longmans Green and Co., 1899. PDF.

Mukerji, J.N. *Sāṁkhya: or The Theory of Reality*. Calcutta (now Kolkata): S. N. Mukerji, 1930. Print.

Patañjali. *Yogasūtra*. Trans. (in eng) Rajendralal Mitra. *Yoga Aphorisms of Patanjali*. Calcutta (now Kolkata): Asiatic Society of Bengal, 1883. Print. [Bibliotheca Indica Series No. 462]

Radhakrishnan, S. *Indian Philosophy*. Vol-II. New Delhi: Oxford University Press, 2017 (16th impression) (1st Indian edition 1940). Print.

Seal, Brajendranath. *The Positive Sciences of the Ancient Hindus*. London: Longmans, Green and Co., 1915. Print.

Sehgal, Narender, *et al. Uncharted Terrains: Essays on Science Popularisation in Pre-Independence India*. New Delhi: Vigyan Prasar, 2000. Print.

Sengupta, Anima. *Classical Sāṁkhya: A Critical Study*. New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1982 (2nd ed.) (1st ed. 1981). Print.

Sinha, Nandalal (ed.). *The Sāṁkhya Pravachana Sūtram*. Allahabad: The Panini Office, 1912. Print.

The New Encyclopaedia Britannica. Vol. 24 (Macropaedia). Chicago: Encyclopaedia Britannica Inc., 2003 (15th ed.) (1st ed. 1768). Print.

हिन्दी ग्रन्थसमूह

शास्त्री उदयवीर, *सांख्य दर्शन का इतिहास*, नइ दिल्ली: गोविन्दराम हासानन्द, २०१२

----------, *प्राचीन सांख्य संदर्भ*, नइ दिल्ली: गोविन्दराम हासानन्द, १६६९